# রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা ও কর্ম
# এবং
# উত্তরকালে তাঁর প্রভাব

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান খান
বাংলা বিভাগ, ঢা. বি.

449215

Dhaka University Library
449215

ঢাকা
বিশ্ব
গ্রন্থ

গবেষক :
সাবিনা আফজা হক
এম. ফিল
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা ও কর্ম এবং উত্তরকালে তাঁর প্রভাব"-শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সাবিনা আফজা হক-এর গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা এবং এটি এম. ফিল ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য।

২৪.২.৯৮

ড. নূরুর রহমান খান
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রফেসর ও চেয়ারম্যান**
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা ও কর্ম এবং উত্তরকালে তাঁর প্রভাব" গবেষণা কর্মটি করতে পারার জন্য আমি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান খানের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার গবেষণা কর্মের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন। অনেক দুরূহ বিষয়ে তাঁর প্রাজ্ঞ উপদেশ আমার সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়েছে।

আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম ফজলুল হকের প্রতি। তাঁর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ ব্যতীত এ গবেষণা কর্মটি করতে কখনোই সাহসী হতাম না।

গবেষণা কর্মের জন্য আমার কর্মক্ষেত্র "পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া স্মৃতি ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়" কর্তৃপক্ষ আমাকে প্রয়োজনীয় ছুটি মঞ্জুর করায় আমি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার প্রতিষ্ঠান প্রধান অধ্যক্ষ একরামুল হক ও সহকর্মী আব্দুল বাকের, তারক চন্দ্র বর্মণসহ অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমার গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন। কলেজ লাইব্রেরীয়ান দারাজুল হোসেন চৌধুরী সময়ে-অসময়ে আমাকে প্রয়োজনীয় বইসহ বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেছেন। আমি তাদের সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার জন্য যে সকল গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, স্টেপস টুয়ার্ডস লাইব্রেরী, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী ইত্যাদি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সকলের সহযোগিতার জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

একতা সম্পাদক শাহীন রহমান তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দিয়ে সহযোগিতা করায়, আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ডাঃ সেলিম রেজা, কিংশুক রেজা অর্পণ এবং কাশফিয়া নাহরিন অরিত্রির নিরন্তর অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতার ফলেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে এ গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাওয়া। দ্রুততম সময়ে গবেষণা–নিবন্ধটি যত্নের সঙ্গে কম্পোজ করে দেওয়ার জন্য আমি মাসুদুর রহমান মাসুদকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচিপত্র


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| কৃতজ্ঞতা | ০১ |
| প্রস্তাবনা | ০২ |
| **প্রথম অধ্যায়** | |
| সমকালীন সমাজবাস্তবতা | ০৫ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | |
| রোকেয়া জীবনী | ১৭ |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | |
| চিন্তা ও কর্ম | ২৯ |
| **চতুর্থ অধ্যায়** | |
| সাহিত্য সাধনা | ৫২ |
| **পঞ্চম অধ্যায়** | |
| সমকালে রোকেয়া | ৯১ |
| **ষষ্ঠ অধ্যায়** | |
| উত্তরকালে রোকেয়ার প্রভাব | ১০২ |
| উপসংহার | ১২৮ |
| সহায়ক বাংলা গ্রন্থ | ১৩০ |
| সহায়ক পত্র-পত্রিকা | ১৩৪ |

Dhaka University Institutional Repository

# প্রস্তাবনা

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন–একটি বিস্ময়। সময়ের তুলনায় চিন্তা-চেতনায় সহস্র বছর অগ্রগামী রোকেয়া বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনে একটি স্বীকৃত নাম। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রমাবাঈ, সরলা দেবী চৌধুরানী ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ-ই ভারতীয় নারীবাদী চিন্তা ও নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ।

রাজা রামমোহন–বাংলার প্রথম নারীবাদী পুরুষ। নারীর শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। ১৮২৯ সালে তাঁর উদ্যোগে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'সতীদাহ প্রথা' বিলুপ্ত আইন পাশ হয়। ধর্মের নামে উৎপীড়ন– নারীর সহস্র বছরের ইতিহাস। 'জীয়ন্তে মরা– নারীর ভাগ্যলিখন'– খণ্ডাতে উদ্যোগ নেন নারীবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি 'বিধবা-বিবাহের' শাস্ত্রীয় প্রমাণাদী উল্লেখপূর্বক সমাজে বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন তিনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে– কৃষ্ণভাবিনী দেবী, রাসসুন্দরী দেবী, কামিনী সুন্দরী দেবী, মোক্ষদয়িনী দেবী প্রমুখ সংবাদপত্রে নারীর বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন। এ সময়কালেই কবি এবং সমাজসেবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন কুমিল্লার নওয়াব ফয়জুন্নেসা। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর দু'কন্যা হিরন্ময়ী দেবী চৌধুরানী ও সরলা দেবী চৌধুরানী নারী শিক্ষা ও সচেতনতা তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

ভারতের অন্যতম নারীবাদী পণ্ডিত রমাবাঈ ১৮৮৯ সাল থেকে নারী অধিকারের পক্ষে দেশব্যাপী গড়ে তোলেন আন্দোলন।

১৮৪৯ সালে মহাত্মা বেথুন কর্তৃক কলকাতায় স্থাপিত হয় "ভিক্টোরিয়া স্কুল"। তাঁর মৃত্যু পরবর্তী এই স্কুলের নাম হয় "বেথুন স্কুল"।

অগ্রসর ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলশ্রুতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় বাঙালি শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নব জাগরণ ও পরিবর্তনের সূচনা হয়– তা বাংলার রেঁনেসাস বলে অভিহিত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা বঞ্চিত অনগ্রসর মুসলিম সম্প্রদায় এ পরিবর্তনের ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যায়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলিম সমাজেও ধীরে ধীরে পরিবর্তনের সূচনা হতে থাকে এবং আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তৈরি হয় সচেতনতা। শিক্ষিত তরুণদের মাঝে অনুভূত হতে থাকে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। কলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হতে থাকে মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়-যদিও এর কোনটিই দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করেনি। এমনি এক সামাজিক পটভূমিতে রোকেয়া বাংলার নারীমুক্তির বিশেষত শিক্ষা ও অধিকারবঞ্চিত বাঙালি মুসলিম নারীর মুক্তির লক্ষ্যে অগ্রসর হন নারীশিক্ষা বিস্তারে। শিক্ষা তৈরি করে আত্মমর্যাদাবোধ, সচেতনতা। সচেতনতা তৈরি করে অধিকার বোধ, অধিকার আদায়ের মানসিকতা–রোকেয়ার এই বোধই তাঁকে পরিচালিত করেছে নারীশিক্ষা বিস্তারের জীবনব্যাপী সংগ্রামে। শিক্ষাই পারে নারীকে তার অধ:পতিত অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে– আর তাই মুসলিম নারী সমাজ তথা পৃথিবীব্যাপী নারীসমাজের অবমাননাকর অবস্থাদৃষ্টে ব্যথিত রোকেয়া কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন নিজ সম্প্রদায়ের অবরোধবন্দিনী, মানবিক অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজকে শিক্ষিত, সচেতন মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দুরূহ সংগ্রামকে।

*Dhaka University Institutional Repository*

## প্রথম অধ্যায়

# সমকালীন সমাজবাস্তবতা

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বাংলার সাহিত্য ও সামাজিক ইতিহাসে এক অনন্য নাম। তিনিই বঙ্গদেশের প্রথম নারীবাদী নারী। যে সময়ে প্রাগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রথম আধুনিকা বলে অভিহিত জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, নারী অধিকার সচেতন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরাণী, কৃষ্ণভাবিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী কেউই নারীর ঐতিহ্যিক ভূমিকার বাইরে অন্য কোন ভূমিকার কথা চিন্তাও করতে পারেন নি, সেই সময়ে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের কঠোর অবরোধে বন্দিনী এক নারী বেগম রোকেয়াই বাঙালি সমাজে প্রথম পুরুষের সাথে নারীর সমঅধিকার দাবি উত্থাপন করেন এবং ঐতিহ্যিক ভূমিকার বাইরেও নারীর কর্মক্ষেত্র নির্দেশ করেন। নারীমুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ও নারীকে অবরোধবাসিনী করে রাখা প্রথার মূলোচ্ছেদ— এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে লেখা, বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, নারী সংগঠন গড়ে তোলা এবং পরিচালনার মাধ্যমে তিনি আমৃত্যু তার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের মাত্র ২৩ বছর পরে ১৮৮০ সলের ৯ ডিসেম্বর পায়রাবন্দের জমিদার আবু আলী হায়দার সাহেবের ঘরে রোকেয়ার জন্ম। সেই সময়কালে বাঙালি মুসলিম সমাজ তথা সমগ্র ভারতীয় মুসলিম সমাজের অবস্থা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সংকটপূর্ণ। ব্রিটিশ শাসকের অধীন মুসলমান সমাজের সমকালীন আর্থ-সামজিক অবস্থা ছিল তখন চরমভাবে বিপর্যস্ত।

বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন দিল্লীর শাসন ক্ষমতা দখল করে তখন ঘটনাক্রমে দিল্লীর শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা ছিলেন মুসলমান। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মুসলমান মোঘল শাসকদের হটিয়ে এ দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে। ফলে শ্রেণী নির্বিশেষে দেশীয় মুসলমানরা যেমন ক্ষমতাচ্যুত নবাব বাদশাদের প্রতি একটা স্বজাতিসুলভ সহানুভূতি বোধ করতো তেমনি নতুন শাসক ইংরেজদের প্রতি তারা ছিল বিরূপ মনোভাবাপন্ন। শাসক জাতির প্রতি এই বিরূপতা থেকেই এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজদের প্রতি ছিল বিমুখ এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে শাসক সম্প্রদায়কে অসহযোগিতার নীতিতে ছিল বিশ্বাসী।

অনুরূপভাবে ক্ষমতাসীন ইংরেজরাও অনেকদিন পর্যন্ত বিজিত মুসলমানদের খানিকটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখত। তাদের শাসন ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য পরবর্তীকালে তারা যে

Dhaka University Institutional Repository

পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে— যেমন : ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ১৮২৮ সালের লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আইন, এর সবকটিই এ দেশের মুসলমান সমাজ বিশেষতঃ উচ্চবিত্ত মুসলমান শ্রেণীর স্বার্থের বিপক্ষে যায়।[১] ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফারসির পরিবর্তে রাজভাষা বা সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তনের ফলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও চাকুরীজীবী মুসলমানদেরও জীবিকার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। এ দেশের মুসলমানদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি জমি ও দ্বিতীয় অবলম্বন চাকুরি দুই-ই হারিয়ে মুসলামান সমাজ হত্যোদ্যম ও দিশেহারা হয়ে পড়লো। ফলে পরবর্তী সময়ে বাঙালি মুসলমান কেবল অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে গিয়ে পড়েছে। প্রতিবেশী বাঙালি হিন্দুর মতো তারা ইংরেজি শেখেনি। তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো কোন সমাজ সংস্কারক আসেন নি।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে এক বহুল আলোচিত অধ্যায়। এ সময়েই বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা একটি নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পর্কের বলয়ে চলে আসে। উপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আওতায় উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি এক নতুন যুগের উন্মেষ ঘটায়। এই নতুনের অভিযাতে পাশ্চত্য শিক্ষা-সভ্যতার সংস্পর্শে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (মূলত মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী) মধ্যে এক নবচেতনা এসেছিল। এ প্রসঙ্গে গবেষক মোরশেদ শফিউল হাসানের মন্তব্য–

"এই চেতনাই আধুনিকতা–যা তৎকালীন বাঙালি দালাল বুর্জোয়া শ্রেণীকে উজ্জীবিত করেছিল প্রচলিত সামাজিক আচার-আচরণ সংস্কার, প্রথা ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে। পাশাপাশি নতুন উৎপাদন কাঠামোয় শ্রেণী স্বার্থ সচেতন এই শ্রেণী নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা ঘটায়। সামগ্রিক অবস্থাটিকে একদল ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী বাংলার নবজাগরণ বলে আখ্যায়িত করতে চান।"[১] কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে একে নবজাগরণ বলে মেনে নেয়া যায় না।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়ের কিছু অংশকে সমাজের প্রচলিত অনেক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসু করে তুলেছিল বটে এবং তারা প্রচলিত অনেক আচার-সংস্কার সম্পর্কে বিদ্রোহও করেছিল কিন্তু সমাজের বৃহৎ অংশই এ আন্দোলন সম্পর্কে ছিলেন নিরুৎসাহ এমনকি অজ্ঞ।

অন্যদিকে উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রধান পুরুষেরা তাদের একান্ত পার্শ্ববর্তী বাঙালি মুসলমান সমাজ সম্পর্কে আশ্চর্যরকম উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন।[২] বলা হয়ে থাকে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নবজাগরণ বা রেনেসাঁস ঘটেছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে নতুন রাজ সরকারে চাকুরি গ্রহণ, কোম্পানীর দালালী, ইংরেজ সাহেবদের মুন্সিগিরি করে কলকাতা শহর ও তার আশেপাশের এলাকায় এ সময় কালেই একটি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।

১৮১৭ সালে এদের শিক্ষার জন্যই কলকাতায় স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ। রামমোহন প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি হিন্দু কলেজের শিক্ষা, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও প্রমুখের প্রত্যক্ষ প্রভাব, উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যার চর্চা এবং পাশ্চাত্য দর্শন ও ভাব ধারার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির মধ্য থেকে ক্রমে একটি enlightened group গড়ে ওঠে। বাঙলাদেশের (আরো নির্দিষ্ট করে বললে কলকাতা শহরের) উনিশ শতকীয় ভাব-বিপ্লব মূলত এদেরই কীর্তি। সীমিত অর্থে বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণ প্রয়াসের সাথে মুসলমান সমাজের কোন অংশেরই কোন যোগ ছিল না।[৩]

শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজ তথা সমগ্র ভারতীয় মুসলিম সমাজে চরম অবনতি ও অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সময় মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় হতাশাজনকভাবে কতখানি পিছিয়ে পড়ে তা নিম্নোক্ত ছকে পরিলক্ষিত হয়—

**হিন্দু মুসলমানের শিক্ষিতের অনুপাত[৪]**

শিক্ষা বছর–১৮৭১ খ্রিঃ

**তালিকা - ১**

| ক্র. নং | প্রতিষ্ঠান | হিন্দু | মুসলমান | অন্যান্য | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | স্কুল | ১,৪৯,৭১৭ | ২৮,০৯৬ | ১৫,৪৮৯ | ১,৯৩৩০২ |
| ২. | কলেজ | ১.১৯৯ | ৫২ | ৩৬ | ১,২৮৭ |
| | মোট | ১,৫০,৯১৬ | ২৮,১৪৮ | ১৫,৫২৫ | ১,৯৪,৫৮৯ |

শিক্ষার অভাবে উনবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে মুসলমান সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের মূল আদর্শ সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের নীতি থেকে ভারতীয় মুসলিম তথা বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় তখন অনেক দূরে সরে যায়। তৎকালে মুসলিম সমাজে শ্রেণীভেদ প্রথার কঠোরতাও পরিলক্ষিত হয়।[৫]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের ফারায়েজী আন্দোলন ও ওহাবী আন্দোলন যদিও ব্রিটিশ বিরোধী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদমূলক আন্দোলন ছিল, তথাপি এ আন্দোলনগুলো ছিল মূলত ধর্মীয়। উক্ত আন্দোলনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে ইসলামের আদি অবস্থায় ফিরে যাওয়া।[৬] এই আন্দোলনগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলা চলে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ আন্দোলনগুলি কোন উল্লেখযোগ্য ও যুগোপযোগী ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়নি।[৭] বরং এ আন্দোলন আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি করে তাকে নিয়ে গিয়েছিল রক্ষণশীলতার সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে।

**হিন্দু ও মুসলমানের শিক্ষিতের অনুপাত [৮]**

শিক্ষা বছর–১৮৪০–৪১-৪৬

তালিকা - ২

| | মুসলমান | হিন্দু |
|---|---|---|
| ফারসী জানা | ১ ১/৩ | ১ |
| বাংলা জানা | ১ | ২৪ |
| শিক্ষারত | ১ | ১০ ৯ |
| পড়তে সক্ষম | ১ | ৭ ১/৩ |
| মোট শিক্ষিত | ১ | ৯ |

**বাংলা ও ফরাসী শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলামানের অনুপাত [৯]**

শিক্ষাব বছর – ১৮৪০–৪১-৪৬

তালিকা – ৩

| বাংলা জানা | | ফারসী জানা | |
|---|---|---|---|
| হিন্দু | ১৯ ২/৩ | মুসলমান | ১ |
| হিন্দু | ৩২ ৪ | হিন্দু | ১ |
| মুসলমান | ১ | মুসলমান | ১ ১/৩ |
| মোট | ১২ ৯ | মোট | ১ |

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় মুসলমানদের এই সংকটকালে সমাজে নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ও সৈয়দ আমীর আলীর মতো তিনজন সমাজ সচেতন মনীষীর আবির্ভাব ঘটে যাঁরা ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা ও মুসলিম সমাজে (মূলত পুরুষ সমাজের মধ্যে) পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর নিপীড়িত ও হতাশাগ্রস্ত ভারতীয় মুসলিম সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[১০]

নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) "Mohomedan Educaiton in Bengal" শীর্ষক এক নিবন্ধে ভারতীয় মুসলিম সমাজের তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা এবং তৎসঙ্গে মুসলমানদের জন্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। এই প্রবন্ধে তিনি কলকাতা মাদ্রাসার ইতিহাসও বর্ণনা করেন। কিন্তু নওয়াব আবদুল লতিফ তাঁর প্রবন্ধে কোথাও মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি।[১১]

নবাব আবদুল লতিফ বিশ্বাস করতেন, ইংরেজদের প্রতি বৈরিতা নয় বরং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার মধ্যেই ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই সরকারের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা এবং মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো এ-দুটো লক্ষ্যেই তাঁর সারা জীবন অতিবাহিত হয়েছিল।[১২]

কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ খোলার ব্যাপারে তিনি সরকারকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। বাঙালি মুসলমানদের জন্য উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি আন্দোলন করেন ফলে হিন্দু কলেজ ১৮৭৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মুসলমান ছাত্রদের এ কলেজে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় মুসলিম সমাজে এ জাতীয় সংগঠন এটিই প্রথম।[১৩]

নবাব আবদুল লতিফের একই সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদও ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৮৬৪ সালে তিনি "Translation Society" প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটি "Scientific Society" নামে পরিচিত হয়।[১৪]

১৮৭৫ সালে আলীগড়ে সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠা করেন 'এ্যাংলোরা ওরিয়েন্টাল কলেজ'— যা পরবর্তীতে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।[১৫] সৈয়দ আমির আলী ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' পরে এটি 'সেন্ট্রাল মোহামেডান' নামে পরিচিত হয়।[১৬]

মুসলমান সমাজের নানা আন্দোলনের ফলে সরকার বাধ্য হয় মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করতে। ফলে ১৮৭১ সালে হুগলী মাদ্রাসা, ১৮৭৩ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এসব মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হয়।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

এই সময়েই দেওবন্দ মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসন-বিরোধী একটি ভাবধারা গড়ে ওঠে। যুক্ত প্রদেশের মুহম্মদ কাসিম নানাতাবী (১৮৩২-৮০) ও মুহম্মদ রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (১৮২৮-১৯০৫) দেওবন্দের একটি আরবী মক্তবকে 'দার-উল-উলুমে' উন্নীত করে 'দেওবন্দ মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৭ সালে। অল্পকালের মধ্যেই 'দেওবন্দ মাদ্রসা' ইসলামী শিক্ষার একটি প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয় ও দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতে থাকে।[১৮]

তবে আমরা লক্ষ্য করি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলমান পুরুষদের মধ্যে ধীরে হলেও যুগের প্রতি সচেতনতা বোধ তৈরি হতে থাকে এবং তারা আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী এবং বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষায়তনগুলোতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা আশাপ্রদভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও তখনো হিন্দু ছাত্রদের তুলনায় মুসলমানেরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পশ্চাদপদ ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান পুরুষদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শুরু হলেও নারী শিক্ষা প্রশ্নে মুসলমান সমাজ তখনো রক্ষণশীল রয়ে যায়। ১৮৬৫ সালে বামাবোধিনী পত্রিকার এক তথ্য থেকে জানা যায়, সেই সময়ে মুসলমানগণ তাদের কন্যাদের স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকেই সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় কিছু সংখ্যক মুসলমান মেয়ের স্কুলে পড়ার তথ্য পাওয়া যায়। এরপূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম বালিকার বিদ্যা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের খবর জানা যায়। তবে তখনও যে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি তা জানা যায় ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে, "স্ত্রী শিক্ষার সর্বপেক্ষা উন্নতি পারসী সমাজে এবং সর্বাপেক্ষা দুর্গতি মুসলমানদের মধ্যে।"[১৯]

**১৮৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রীর তালিকা[২০]**

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | মোট ছাত্রী সংখ্যা | মুসলমান ছাত্রী | হার |
|---|---|---|---|
| উচ্চ ইংরেজি বলিকা বিদ্যালয় | ১৮৪ | × | × |
| মাধ্যমিক ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় | ৩৪০ | ৬ | ১.১ |
| দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ৫২৭ | ৬ | ১.১ |
| দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৭,৪৫২ | ১,৫৭০ | ৮.৯ |
| শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ৪১ | × | × |

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ভারতের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কলকাতার আইনজীবী সম্প্রদায়, সংবাদপত্রসমূহের মালিকগোষ্ঠী ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ আশংকা করেন যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। তারা সমগ্র ব্যাপারটিকে শিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হিন্দুদের প্রতিহত করার জন্য পূর্ব বাংলায় মুসলমান প্রভাব বৃদ্ধিতে বৃটিশ সরকারের আনুকূল্য বলে মনে করেন। প্রথমদিকে মুসলমানরাও বঙ্গভঙ্গকে মেনে নিতে চাননি। কিন্তু ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ঢাকায় এসে মুসলমানদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, ঢাকাকে রাজধানী করে মুসলিম প্রধান একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হলে মুসলমানদের ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল। ফলে বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে মুসলমানদের মনোভাবে ক্রমে পরিবর্তন হতে থাকে।[২১]

১৯০৫ সালের ২০ জুলাই বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা হয় এবং ১৬ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। শিক্ষিত মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে আশীর্বাদস্বরূপ মনে করেন এবং অগ্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট সুযোগ হিসেবে ধরে নেন। কিন্তু হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গকে মেনে না নেয়ায় মুসলমানরা তাদের প্রতি হিন্দুরা ঈষান্বিত বলে ধারণা করে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা, ঘৃণা, সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্ম নেয় এবং পূর্ববঙ্গে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়।[২২]

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় "নিখিল ভারত মুসলিম লীগ" জন্মলাভ করে। ১৯০৯ সালে ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন পাশ হয়। এতে মুসলমানরা পৃথক শাসনতান্ত্রিক সত্তা অর্জন করেন এবং তাদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন-পদ্ধতি নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়।[২৩]

১৯১৪ সালের আগস্টে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯১৮ সালে থেমে যায়।

১৯১৯ সালের প্রথম দিকে রাউলাট বিল আইনে পরিণত হয়। এ সময়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত হয়। এতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করে এবং স্বল্পকালের জন্য হলেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হয়।[২৪] ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। বলা যায় অসহযোগ আন্দোলনই হলো সারা ভারতব্যাপী প্রথম গণ-অভ্যুত্থান।

১৯২৩ এর জুলাই মাসে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লাজপত রায় প্রমুখ হিন্দু নেতা ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মহাসভা' পুনরুজীবিত করেন এবং শুদ্ধি অভিযান শুরু করেন। ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং মুসলমানরাও এর প্রতিক্রিয়ায় 'তাবলীগ সমাজ' গঠন করেন। দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত গান্ধীর রাজনৈতিক আঁতাত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[২৫]

১৯২৪ সালে বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে কোরবানির ঈদে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধে এবং ১৯২৬ সলে বিভিন্ন প্রদেশে এ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলনের

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে হিন্দু মুসলিমের যে ঐক্য স্থাপিত হয়, পরবর্তীকালে তা ভেঙ্গে যেতে থাকে এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ ক্রমে বৃদ্ধি পায়।[২৬]

পরবর্তীকালে এ বিরোধের জের ধরেই দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

মুসলিম নারীদের অবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে প্রথম সচেতনতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায় সৈয়দ আমীর আলীর মধ্যে। আমীর আলী অনুধাবন করেন যে, সমাজে প্রচলিত কঠোর পর্দা প্রথাই মুসলিম নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ, তাই তিনি পর্দাপ্রথার কঠোরতা শিথিল করার প্রস্তাব করেন এবং নারীজাতির উন্নতি ব্যতীত সমাজের উন্নতি অসম্ভব বিধায় স্ব-সমাজের উন্নতির জন্য নারীদের ইসলামের আদি যুগের সম্মানিত অবস্থায় উন্নীত করার আহ্বান জানান। আমীর আলীর উদ্যোগে "Central National Mohammadan Association" নারী শিক্ষার উন্নতিকল্পে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে। পরবর্তী সময়ে এই কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।[২৭] তবে ঊনবিংশ শতাব্দী শেষের দিকে নারী শিক্ষা প্রশ্নে বাঙালি মুসলিম সমাজে পরিবর্তন সূচিত হয়। এই শতাব্দীর আশির দশকে ঢাকা সুহৃদ সম্মিলনী অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীতে মেয়েদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন ও সেই তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানের যেমন কলিকাতা, বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, সিলেট, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহে মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম বছর পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মোটা ৩৭ জন ছাত্রী। ১৪ জন উর্দু ভাষায় ও ২৩ জন বাংলা ভাষায় পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে উর্দু বিভাগে ১২ জন এবং বাংলা বিভাগে ২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল। এ ব্যবস্থায় মেয়েরা অন্তপুরে বসেই স্ব স্ব অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে পারতেন। মৌখিক পরীক্ষক অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সম্মিলনী কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। ডাফটন ইনষ্টিটিউশন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফার্সীর অধ্যাপক মেয়রাজউদ্দীনের সহযোগিতায় মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য 'তোহ্ফাতুল মোসলেমিন' (১২৯০) গ্রন্থখানি রচনা করেন।[২৮]

ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই তিন দশক জুড়েই পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজের নারীরা ছিল অবহেলিত, স্ত্রীশিক্ষার তেমন কোন উদ্যোগ ছিল না এবং স্ত্রী স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিলো না। নারী সমাজ ছিলো বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের অভিশাপের শিকার। বিধবা বিবাহ সমাজে অপ্রচলিত ছিলো। সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ও মিথ্যা অভিজাত্যের দম্ভ ছিলো, ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন এক শ্রেণীর লোকের জীবনাচরণে বিভিন্ন কুসংস্কার বিরাজমান ছিলো। সেই সময়ে মুসলমান সমাজে অবরোধ প্রথা এত কঠোররূপ ধারণ করেছিলো যে, নিকটাত্মীয় পুরুষেরাও মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে পারতেন না। এমনকি অনাত্মীয় নারীদের থেকেও মেয়েদের পর্দা করতে হতো। ফলে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি। মেয়েদের পর্দার মধ্যে রাখা হতো সাত অথবা সাতের কাছাকাছি বয়স হলেই। সম্ভ্রান্ত পরিবারের অবরোধবাসিনী অথবা নিভৃতচারিণী নারীরা প্রধানত মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করতো ধর্মীয় এবং নৈতিকতা বিষয়ে। মেয়েদের কোরআন পাঠ শিক্ষা, কিছু উর্দু এবং মৌলিক হিসাবের দক্ষতা অর্জনের জন্য ওস্তাদনী বা মহিলা শিক্ষক রাখা হতো ।[২৯]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের অভিঘাতে মুসলিম সমাজে আবারও নতুন করে ফিরে আসে রক্ষণশীলতা এবং শুরু হয় সনাতনী মূল্যবোধের নতুন চর্চা। এর বিরূপ প্রভাব পড়ে মহিলাদের ওপর। তারা তখন ঐতিহ্যচর্চা'র আধারে পরিণত হয়। ১৮৫৭ সালের এক দশক পরে একজন রক্ষণশীল মুসলমান নেতা কলকাতার এক জনসভায় নারী শিক্ষার বিরোধিতায় স্পষ্ট অভিমত রাখেন। এসবের ভিত্তি ছিল একটাই এবং তা হলো পর্দা প্রথা।[৩০]

স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮০) সংস্কার আন্দোলনের নেতা এবং মুসলমান বালক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট কোন মত ব্যক্ত করেননি। অবশ্য তিনি নারীশিক্ষার বিরোধিতাও সেভাবে করেননি। সম্ভবতঃ তিনি মনে করতেন আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটি তখনও নারী শিক্ষার অনুকূল হয়ে ওঠেনি। তবে সৈয়দ আহমদের শিষ্যদের অনেকে নারী শিক্ষার বিষয়ে স্পষ্ট ভূমিকা পালন করেন। যেমন— আলতাফ হোসেন হালী, সৈয়দ মমতাজ আলী এবং তার স্ত্রী মোহাম্মদী বেগম, সৈয়দ মাহমুদ এবং শেখ আবদুল্লাহ। শেখ আবদুল্লাহ আলীগড়ে একটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। তাঁরা প্রথম নারীবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন (আলীগড় থেকে 'খাতুন', লাহোর থেকে 'তাহাজিবুননেছা', আগ্রা থেকে 'পর্দানশীন', দিল্লী থেকে 'ইসমত' (প্রভৃতি)। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, শামসুননাহার মাহমুদ এবং অন্যান্য সংস্কারবাদীরা আলীগড়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। [৩১]

## ১৯১৮ সালে সওগাতের প্রতিষ্ঠাযুগে বাংলার মুসলিম নারীর অবস্থা :

যুগ যুগ ধরে বাংলার মুসলিম নারীদের জীবন নানা অত্যাচার, অবিচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের, পঙ্কিলে নিমজ্জিত ছিলো। পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য দেশের নারীর অবস্থা এ রূপ শোচনীয় ছিলো কি-না সন্দেহ।

সওগাতের প্রতিষ্ঠাযুগে বাংলার নারীর অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে সওগাত সম্পাদকের ভাষ্য,

'নারীর জীবন্ত সত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে সংস্কারবদ্ধ সমাজ তাদের দেহ ও মনকে জড়পিণ্ডবৎ করে রেখেছিল। তখন মেয়েদের শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল, তাদের বাংলা শিক্ষার বিরুদ্ধেও সমাজের কঠোর নির্দেশ বলবৎ ছিল। মেয়েদের বাংলা শিক্ষাদানকে অনেক মুসলমান ধর্মবিরোধী কাজ বলে মনে করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

গুরুতর রূপে অসুস্থ হলেও মেয়েকে ডাক্তার বা কবিরাজ দেখানো হতো না পর্দা নষ্ট হওয়ার বা দোজখে যাওয়ার ভয়ে। রোগাক্রান্ত নারীরা কংকালসার হয়ে থাকতো অথবা রোগে তাদের জীবনের অবসান ঘটতো।

খান্দানী এবং অর্থশালী লোকের (এরা সংখ্যায় ছিল নগণ্য।) পত্নীরা ছিল তাদের ভোগের বস্তু, আর গরীব লোকের স্ত্রীরা ছিল ক্রীতদাসীরও অধম। পরিবারে তাদের কোন মর্যাদাই ছিল না। তাদের দিয়ে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করানো হতো, নিত্যদিন চলতো অমানুষিক অত্যাচার ।

কঠোর অবরোধের নিগ্রহ ছাড়াও উৎপীড়ন, অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনা ছিল সে যুগের নারীদের সারা জীবনের সঙ্গী। প্রতিবাদের ভাষা তাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আজীবন অবস্থান করার ফলে নিজের দুর্গতি অনুভব করার শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলেছিল।

মুসলিম সমাজে নারীদের জন্য ইসলামের বিধান ছিল কার্যতঃ অচল। সমাজে তারা গৃহাবদ্ধ জীববিশেষরূপে পরিগণিত ছিল। ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও স্বাধীনতা দিয়েছে বাংলার মুসলিম সমাজ সে অধিকার থেকে তাদের জোর করে বঞ্চিত রেখেছিল। স্বামীরা খেয়ালখুশি অনুযায়ী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত।

কোনো মেয়ের লেখা পুরুষের চোখে পড়লে তা বেপর্দা বলে গণ্য হতো। এ কারণে লেখাপড়া শেখাই ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ।

শাস্ত্রের নামে সমাজপতিরা বলতেন— 'বন্দী জীবনই নাকি আল্লাহ মুসলিম নারী সমাজের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।' কিন্তু তথাকথিত শাস্ত্রের এ ধরণের নির্দেশ ছিল পুরুষজাতির তৈরি এবং পুরুষদের মুখেই তা উচ্চারিত হতো। সমাজের এক শ্রেণীর লোক নারীর উপর অত্যাচারকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমর্থন করতেন। বিবাহে কন্যার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি অপরিহার্য, কোরানের বিধান থেকে এটাও স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে, পাত্র নির্বাচন করার অধিকার পাত্রীরও রয়েছে, নাবালিকার বিয়ে শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট নয়। তথাপি সমাজে নাবালিকা বিবাহ চলত নির্বিঘ্নে, নির্বিবাদে এবং সংখ্যাতীতভাবে। মেয়েদের কোন সম্মতি না নিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে কবুল ইজাব পর্যন্ত ভালরূপে গ্রহণ না করে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হতো। নারীকে সেখানে দেহমন বিশিষ্ট কোন জীব হিসেবে ধরা হতো না। নাবালিকা বিবাহ, অতঃপর স্বামীর অত্যাচার, অকাল মাতৃত্ব, স্বাস্থ্য বিনাশ, দুর্বল সন্তান লাভ, এ সবের অন্তরালে সমাজ মনের যে ছবিটি ফুটে উঠত তাতেও মনে হতো না যে নারীরা মানুষ।

প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের অভিভাবকও যার সাথে খুশি মেয়ে বিয়ে দিতেন। বিয়ের মজলিস থেকে একজন উকিল ও দু' জন সাক্ষী গিয়ে মেয়ের সম্মতি গ্রহণ করা ইসলাম সম্মত বিধান। কিন্তু এই সম্মতি না দেবার স্বাধীনতা কন্যার কতটুকু আছে? কন্যা যদি বিয়েতে সম্মতি না দেয় তাহলে তার কলংক এত বেশি

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারিত হবে যে তার পক্ষে গৃহে বা সমাজে বাস দুষ্কর হয়ে পড়বে। কন্যার জন্য অন্য আর একটি পাত্র পাওয়াই দুঃসাধ্য হবে। সুতরাং দেখা যায় ইসলাম বৈবাহিক ব্যাপারে নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, বাংলার মুসলমান সমাজ তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করেছে।"[৩২]

বাংলার মুসলমানদের এই অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অন্ধ গোঁড়ামির যুগে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ ইউনিয়নের খোর্দ্দ মুরাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রোকেয়া। রোকেয়ার পিতা জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের পায়রাবন্দ পরগণার জমিদার ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা সাবের পরিবারে পাপকার্য বলে গণ্য হতো। কোরান ছাড়া অপর কোন গ্রন্থ পড়বার অধিকার মেয়েদের ছিল না। এই পরিবারে অবরোধ প্রথাও ছিল অত্যন্ত কঠোর। অনাত্মীয় বা দূর সম্পর্কের আত্মীয় পুরুষ দূরে থাক— অনাত্মীয় বা অপরিচিত স্ত্রী লোকদের থেকেও পরিবারের মেয়েদের পর্দা করতে হতো। ছোট-ছোট মেয়েদেরও এ প্রথা কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো। অর্থাৎ তৎকালীন আর দশটি মুসলিম অভিজাত পরিবারের মতোই রোকেয়ার পরিবারও যুগধর্ম বা যুগবৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচালিত ছিল।

**তথ্য সূত্র :**


১। মোরশেদ শফিউল হাসান : বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৮২ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১ (১ 'ইতিহাস সূত্র')।

২। আবদুল মান্নান সৈয়দ : বেগম রোকেয়া, প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, অবসর, পৃ. ৪৩।

৩। মোরশেদ শফিউল হাসান : বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩ (১ 'ইতিহাস সূত্র')।

৪। তাহমিনা আলম : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা– চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩ নভেম্বর, ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী।

৫। ঐ, পৃ. ৩।

৬। ঐ, পৃ. ৩।

৭। ঐ, পৃ. ৩।

৮। আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, ১৯৬৪, প্রথম প্রতিভাষ সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ৪৯।

৯। ঐ।

১০। তাহমিনা আলম : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪। নভেম্বর ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী।

১১। ঐ, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

১২। শাহজাহান মনির : বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩২।

১৩। ঐ পৃ. ৩৩।

১৪। ঐ পৃ. ৩১।

১৫। ঐ পৃ. ৩১।

১৬। ঐ পৃ. ৩৪।

১৭। ঐ পৃ. ৩৩।

১৮। ঐ পৃ. ৩৪।

১৯। তাহমিনা আলমঃ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা- চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬, ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী।

২০। ঐ, পৃ. ৫।

২১। শাহজাহান মনির : বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা – প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪০।

২২। ঐ পৃ. ৪১।

২৩। ঐ পৃ. ৪৩।

২৪। ঐ পৃ. ৪৫।

২৫। ঐ পৃ. ৫২।

২৬। ঐ পৃ. ৫৩।

২৭। তাহমিনা আলম : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা- চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪, ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী।

২৮। তাহমিনা আলম : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা- চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭, ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী।

২৯। সোনিয়া নিশাত আমিন : বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, প্রথম প্রকাশ ২০০২, বাংলা একাডেমী, পৃ–১১০।

৩০। সোনিয়া নিশাত আমিন : বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, প্রথম প্রকাশ ২০০২, বাংলা একাডেমী, পৃ–১০৯।

৩১। সোনিয়া নিশাত আমিন : বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, প্রথম প্রকাশ ২০০২, বাংলা একাডেমী, পৃ–১১০।

৩২। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন : বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগঃ জুলাই, ১৯৮৫, সওগাত প্রেস ৬৬, লয়াল স্ট্রীট, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# রোকেয়া জীবনী

বাংলার ইতিহাসে রংপুর একটি অতি প্রাচীন জনপদ যা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলা থেকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে আসছে। পৌরাণিক নদী ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া বেষ্টিত সীমারেখা, অসংখ্যা ছোট বড় নদ-নদী, তিস্তা, ধরলা, ঘাঘট, মানস, বাঙালি, সংকোশ, দুধতুমার, ফুলকুমার ইত্যাদি নিয়ে গঠিত ছিল এ উর্বর জনপদ।

জনশ্রুতি অনুযায়ী প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের পৌরাণিক রাজা ভগদত্তের রঙ্গমহল ছিল এ অঞ্চলের ঘাঘট নদীর তীরে আর সেটা থেকেই এ অঞ্চলের নাম হয় রংপুর।

রংপুর শহর থেকে ৮ মাইল দক্ষিণে ঘাঘট নদীর তীরে অবস্থিত পায়রাবন্দও একটি অতি প্রাচীন জনপদ। কিংবদন্তী অনুযায়ী রাজা ভগদত্তের কন্যা পায়রাবতীর নামানুসারে এর নামকরণ হয়। অবশ্য এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এই পায়রাবন্দ পরগণারই শেষ জমিদার জহিরউদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী হায়দার সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা ছিলেন রোকেয়া খাতুন। তিনি ১৮৮০ সালে (আনুমানিক) মতান্তরে ১৮৭৭ সালে পায়রাবন্দ ইউনিয়নের খোর্দ্দ মুরাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

সাবের পরিবার পায়রাবন্দে কখন জমিদারি স্থাপন করেন সে ইতিহাস আজোও সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী রোকেয়ার পূর্ব পুরুষগণ মধ্য এশিয়ার তাব্রিজ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং ভারতে মোঘল শাসনের প্রতিষ্ঠালগ্নে ভারতের বিহার প্রদেশের কাটপ মংপুর নামক স্থানে আগমন করেন। এরপরের ইতিহাস জানা যায় না।

*Dhaka University Institutional Repository*

নিম্নে পায়রাবন্দ জমিদার পরিবারের দুইখানা কুর্শিনামা দেয়া হলো

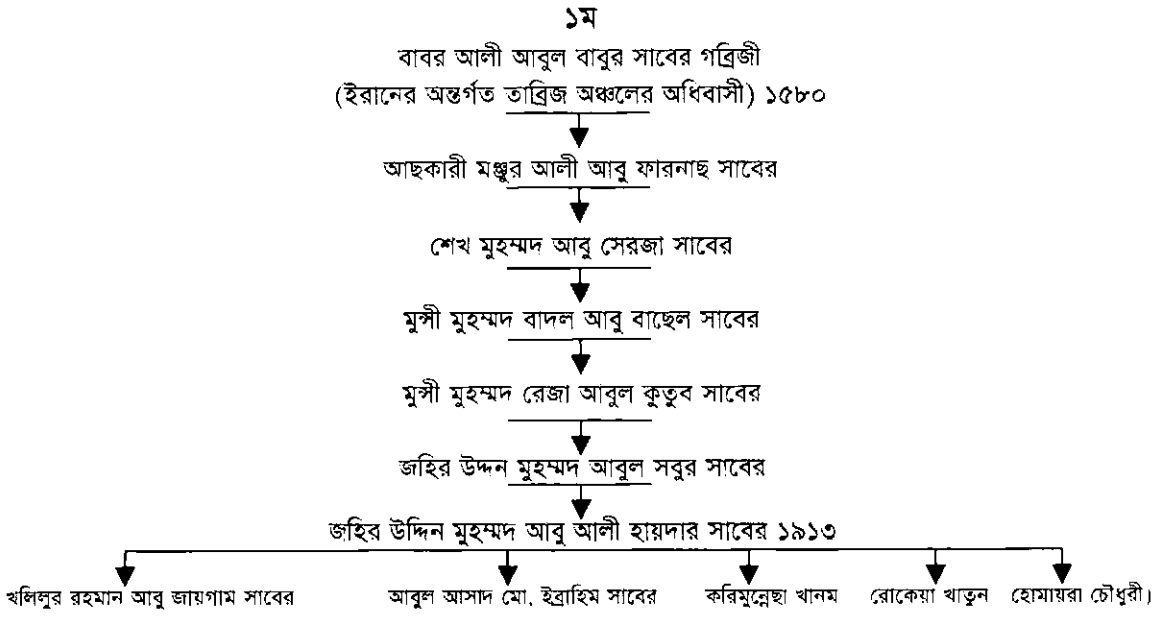


সূত্র : "(বংশলতিকাটি রোকেয়ার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মশিউজ্জামান আবুল ওছামা সাবেরের সৌজন্যে প্রাপ্ত)"– মোতাহার হোসেন সুফী : বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল-২০০১, প্রকাশক আহমেদ মাহফুজুল হক)।

*Dhaka University Institutional Repository*

## বংশ লতিকা – ২য়

টাটি চৌধুরী

↓

জহিরউদ্দিন মুহম্মদ আবুল ছবুর সাবের

↓

জহিরউদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী সাবের চৌধুরী

↓

জহিরউদ্দিন মুহম্মদ আবুল সবুর সাবের

↓

মশিউজ্জামান আবুল ওছামা সাবের

(উৎস : ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৮ নবেম্বর মশিউজ্জামান সাক্ষাৎ বিবরণী থেকে গৃহীত– হায়দায় আলী চৌধুরী : পলাশীর যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা সংগ্রামের পাদপীট ; ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮৭, পৃঃ ৩৫৫-৫৬, সংগৃহীত : রংপুর জেলার ইতিহাস : ডঃ মুহম্মদ মুনিরুজ্জামান– রংপুর জেলার ইতিহাস : প্রকাশনায় রংপুর জেলা প্রশাসন রংপুর, ৩০ জুন ২০০০)।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত বংশলতিকা দুটিতে কোন সংগতি পরিলক্ষিত হয় না। তবে পায়রাবন্দের সাবের পরিবার যে স্থানীয় অধিবাসী এবং বাংলাভাষী ছিলেন না এটা প্রমাণিত। বেগম রোকেয়াও তাঁর সাহিত্য কর্মের কোথাও নিজ বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যাননি। তবে অনুমান করা হয়, রোকেয়ার পিতামহ জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ আবু সবুর সাবেরের (মৃ: ১৮৬৫-৭০ খ্রি:) সময়ে পায়রাবন্দ জমিদারি যা প্রাথমিক পর্যায়ে একটি তালুকদারী হিসেবে সাবের পরিবারের কর্তৃত্বে আসে তা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে। তাঁর পুত্র অর্থাৎ রোকেয়ার পিতার (জন্ম-১৮৭০ মৃত্যু ১৯১৩) সময়কালে পায়রাবন্দ জমিদারীর পতন হয় তাঁর বিলাসী জীবন এবং অধিকাংশ সময় উত্তর ভারতীয় মুসলিম এবং ইউরোপীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের সাথে ব্যাপক মেলামেশার ফলে। বিলাসী জীবনের ব্যয় বহন করতে গিয়ে তিনি লাভজনক মহালগুলোকে ঋণের বিনিময়ে বন্ধক রাখেন— যা পরবর্তীকালে পরিশোধ করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া নিয়মিত পরিদর্শনের অভাবে জমিদারির বাইরে ব্যক্তিগত নামে থাকা সম্পত্তিগুলো নায়েব দেওয়ানদের চক্রান্তে হস্তচ্যুত হয়। এ অবস্থায় বিরাট অংকের সরকারী ও মহাজনী ঋণ রেখে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে বেগম রোকেয়ার পিতা জহির সাবের মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বেগম রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেছা খানমের সাহিত্যকর্ম এবং রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম ও সমাজ কর্ম ব্যতীত পায়রাবন্দ জমিদারির ইতিহাস খুব হৃদয়গ্রাহী নয়। পায়রাবন্দের সাধারণ মানুষের সঙ্গে জমিদারদের কোন সামাজিক সম্পর্ক ছিল না। তারা নিজেদের বহিরাগত পারস্য দেশীয় আশরাফ শ্রেণী হিসাবে গণ্য করে স্থানীয় আতরাফ শ্রেণীর সাথে কোন সম্পর্ক রাখতেন না। এছাড়াও বাড়ির অন্দরমহলে উর্দু/ফারসী ভাষার ব্যবহার স্থানীয় বাঙালি অধিবাসীদের সাথে তাদের এক বিরাট ব্যবধান গড়ে তোলে।

তাদের আচার-আচরণ খাওয়া-দাওয়া সবকিছুতেই বিলাসিতা ও চরম অপব্যয়িতার ছাপ ছিল অকল্পনীয়। রংপুরের অন্যান্য জমিদারের মতো কোন জনহিতকর কাজে তাদের অবদান পরিলক্ষিত হয় না। ধর্মীয় কাজেও একমাত্র পায়রাবন্দ মসজিদ ছাড়া তাদের আর কোন অবদান নেই। উক্ত মসজিদটিতে যে বিশাল পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তি দান করা হয়েছিল বর্তমানে তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। মসজিদটি রোকেয়ার পিতামহ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে নির্মাণ করেন বলে অনুমান করা হয় এবং এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। স্থানীয় মানুষদের শিক্ষার উন্নয়নেও তাদের কোন অবদান ছিল না বললেই চলে। পায়রাবন্দের জনসাধারণের জন্য কোন আধুনিক শিক্ষার পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেন নি। সেখানে আরবী ও ফারসী শিক্ষার জন্য পায়রাবন্দ মাদ্রাসা নামে একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে সেকেণ্ডারী পর্যায়ে আরবী ও ফারসী ভাষায় শিক্ষাদান করা হতো। পায়রাবন্দ জমিদারির অনুদানেই উক্ত প্রতিষ্ঠানটি চলতো। ১৮৭০-৭৫ খ্রি: রংপুর জেলা স্কুলকে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে (আই, এ সেকশন)-এ রূপান্তরিত করার জন্য অসংখ্য জমিদার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে টাকা দান করেছিলেন সেখানেও তাদের কোন নাম পাওয়া যায় না।[১]

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়ার পিতা সাধারণ্যে আবু আলী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং মুখে মুখে ফারসী বয়েত রচনা করতে পারতেন। উর্দুও তিনি ভালো জানতেন। বাংলা জানলেও তিনি মনে করতেন বাংলা হলো আতরাফ শ্রেণীর ভাষা। বাংলা ভাষার চর্চা তিনি বংশ মর্যাদার পক্ষে হানিকর বলেই মনে করতেন। তিনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ও ভোজনবিলাসী ছিলেন। অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও ভোজের বিরাট আয়োজন করতেন। বেহিসেবী খরচের কারণে তার বিরাট অংকের ঋণ হয় আর এ ঋণের দায়েই জমিদারি লাটে উঠে।

শেষ জীবনে অশেষ কষ্টভোগ করে ১৯১৩ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। আবু আলী হায়দার সাবেরের স্ত্রী ছিলেন চারজন। বেগম রোকেয়ার মা রাহাতুন্নেছা সাবেরা চৌধুরাণী ছিলেন প্রথম স্ত্রী। তিনি ছিলেন ঢাকার বলিয়াদির জমিদার হোসেনউদ্দিন চৌধুরী সাহেবের কন্যা। আবু আলী হায়দার সাবেরের চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন ইউরোপীয়। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তিন স্ত্রীর সন্তান-সন্ততি পুত্র নয়জন এবং কন্যা ছয়জন। রোকেয়ারা এক মায়ের দুই ভাই, তিন বোন।

রোকেয়ার বড় দুই ভাই শৈশবে শ্রী অরবিন্দ ঘোষের পিতা ডা. কেডি ঘোষের সংস্পর্শে আসেন সেই সময়ে কেডি ঘোষ ছিলেন রংপুরের সিভিল সার্জন। তাঁর সাহচর্য লাভের ফলে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতা উভয়ের মনেই গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে তারা কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষাগ্রহণ শেষে ইব্রাহিম সাবের সরকারী চাকরিতে যোগ দিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। খলিলুর রহমান সাবের ছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট।[২]

বেগম রোকেয়ার জীবনে তার বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের ও বড় বোন করিমুন্নেছার অবদান ও প্রভাব অপরিসীম। আশৈশব তিনি বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের স্নেহধন্য ছিলেন। লেখাপড়া শিখে জীবন গঠনেও তিনি বড় ভাইয়ের কাছে ঋণী। তার রচিত 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে তিনি বড় ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, "দাদা আমি আশৈশব তোমার স্নেহসাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না পিতা-মাতা, গুরু-শিক্ষক কেমন হয়, আমি কেবল তোমাকেই জানি।" বেগম রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেছা খানমকে অভিজাত পরিবারের নিয়মানুযায়ী কোরআন শরীফ ছাড়া আর কিছু পড়তে দেয়া হয়নি। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখে বিশেষ করে বাংলা পড়ার প্রতি করিমুন্নেছার আগ্রহ দেখে তাঁর পিতা তাঁকে বাংলা পড়ায় সহযোগিতা করেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনায় অতীষ্ট হয়ে দ্রুত তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। সে সময়ে করিমুন্নেছার বয়স ছিলো চৌদ্দ বছর। টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ারের বিখ্যাত জমিদার গজনভী পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পরে তিনি নিজ চেষ্টায় আরবী, ফারসী ও বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্বভাবকবি। পারিবারিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে তিনি অনেক কবিতা রচনা (বাংলা ভাষায়) করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন কবিতাই স্বনামে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এ নিয়ে রোকেয়ার মনেও ক্ষোভ ছিল। করিমুন্নেছা খানমের অর্থানুকূল্যে

Dhaka University Institutional Repository

টাঙ্গাইল থেকে আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী সম্পাদনায় 'আহমাদী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ১৮৮৬ সাল।[৩] অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য পত্রিকাটি বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। বিয়ের নয় বছর পরে তিনি দুটি শিশুপুত্রকে নিয়ে বিধবা হন। অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও লেখাপড়ার স্বার্থে সন্তানদের নিয়ে তিনি কলকাতায় বাস করতে থাকেন। তাঁর দুই সন্তানই কলকাতায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বড় ছেলে আবুদল কমির গজনভীকে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডেও পাঠিয়েছিলেন। রোকেয়া তাঁর লেখাপড়া শেখার জন্য বড় ভাইয়ের মতো বড় বোনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। রোকেয়ার ভাষায়, "অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাংলা পড়ার অনুকূলে ছিলে।" (উৎসর্গ পত্র, মতিচূর ২য় খণ্ড) করিমুন্নেছাই তাঁকে বাংলায় লিখতে উৎসাহ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ রোকেয়া তাঁকে "Sultana's Dream" ও 'মতিচূর' (দ্বিতীয় খণ্ড) উৎসর্গ করেন।

হোমায়রা (মৃত্যু ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬২) শুধু সহোদরা রূপে নন, রোকেয়ার অভিন্ন আদর্শানুসারী হিসেবেও স্মরণীয়। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর মহানব্রতে আত্মনিবেদিত হোমায়রা সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গই করেছিলেন বলা যায়। হোমায়রার একমাত্র কন্যা নুরীকে মাতৃস্নেহে নিজের আদর্শে বড় করে তুলছিলেন রোকেয়া। কিন্তু মাত্র বার বছর (১৮ এপ্রিল ১৯৩১) বয়সেই নুরীর মৃত্যু হয়। রোকেয়ার কর্মজীবনের সঙ্গী ও পরামর্শক হোমায়রা রোকেয়ার মৃত্যুর পরে লেডী ব্রাবোর্ণ ছাত্রী নিবাসের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

পায়রাবন্দের জমিদার পরিবারে ছেলেদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা থাকলেও মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সকল পথ ছিল রুদ্ধ। পর্দার নামে প্রচলিত ছিল অমানবিক অবরোধপ্রথা। সেকালের বাংলার অনেক আশরাফ পরিবারের ন্যায় পায়রাবন্দের সাবের পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শেখার পথেও ছিল অনেক প্রতিবন্ধকতা। লেখাপড়ার শেখার ব্যাপারে বড় বোন করিমুন্নেছার মতো বেগম রোকেয়াও পিতা বা পরিবারের কোন সাহায্য-সহযোগিতা পাননি। আত্মীয়-স্বজনেরা শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহ দান দূরে থাকুক বরং তাকে নানাভাবে বিদ্রূপ ও উপহাস করতেন। তাঁর শৈশব— পাঠ বড়বোন করিমুন্নেছা ও বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের কাছেই হয়েছে। তিনি বড়বোনের কাছে বাংলা ও বড়ভাইয়ের কাছে ইংরেজি ভাষা শিক্ষালাভ করেছেন। দিনের বেলা লেখাপড়া শেখার সময় ও সুযোগ হতো না। তাই দিনের শেষে রাত গভীর হলে ভাই পড়াতেন বোনকে।[৪]

আনুষ্ঠানিক কোন বিদ্যাশিক্ষা রোকেয়ার ভাগ্যে ঘটেনি। পাঁচ বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে একবার কলকাতায় অবস্থানের সুযোগ হয়েছিল তাঁর। এখানে এক মেম শিক্ষিকার কাছে রোকেয়ার বাল্য শিক্ষার সূচনা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। কিন্তু মেম সাহেবের ছাত্রী হলে পর্দার খেলাফ হয়— এ যুক্তিতে তাঁর লেখাপড়া অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়।

মুসলমান সমাজের অসংখ্য নারী যখন সমাজের নিষ্ঠুরতা ও অবিচার, আত্মীয় প্রতিবেশীদের গঞ্জনায় ও সুযোগের অভাবে অপমানিত জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছিলেন— এই অসামান্য নারী তখন সে সব সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে একাকী নিভৃতে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে গবেষক মোঃ শামসুল আলমের উক্তি স্মর্তব্য —

"দুর্লঙ্ঘ্য পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অক্ষরজ্ঞানহীন হয়ে থাকাই সেকালে রোকেয়ার জন্য ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি হয়ে উঠলেন উর্দু ও ফারসীর দক্ষ অনুবাদক, বাংলা গদ্যের একজন শিল্পী এবং ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল ঈর্ষনীয়'।"[৫]

সেই সময়ের তুলনায় একটু বেশি বয়সেই রোকেয়ার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। রোকেয়ার বিয়েতে বিলম্বের কারণ তার দুই শিক্ষিত অগ্রজের ইচ্ছা। মূলত বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের আগ্রহাতিশয্যেই সাখাওয়াত হোসেনের কাছে এ বিয়ের প্রস্তাব প্রেরিত হয়েছিল। সম্ভ্রান্ত বাঙালি ঘরের মেয়েকে পত্নীত্বে বরণ করতে সাখাওয়াতও সানন্দে সম্মত হয়েছিলেন।

বিয়ের সময় রোকেয়ার বয়স ছিল মাত্র ষোল বৎসর। আর সাখাওয়াত হোসেনের প্রায় ৩৮ বৎসর।[৬]

বিতর্কিত জন্ম সালের মতো তাঁর বিয়ের সালও বিতর্কিত। তাঁর স্বামী খান খানবাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন (১৮৫৮-১৯০৯) ছিলেন বিহারের ভাগলপুরের সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারের ছেলে। মোগল আমলের মতো বিহার তখনও ছিলো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত। সাখাওয়াত ছিলেন বিপত্নীক। তার আগের পক্ষের স্ত্রীর এক মেয়ে ছিলো। সাখাওয়াত দেখতেও সুপুরুষ ছিলেন না। পক্ষান্তরে রোকেয়া ছিলেন অপূর্ব মুখশ্রী, দেহ সৌষ্ঠব ও গাত্রবর্ণের অধিকারী।

রোকেয়ার এক ছাত্রী জাহেদা খাতুন এক সাক্ষাৎকারে তাকে 'মোমের পুতুল' এবং কোলকাতা গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মিসেস সরলা রায় তাকে 'খর্বাকৃতি পরমা সুন্দরী নারী' বলে অভিহিত করেছেন। রোকেয়ার বিয়ে প্রসঙ্গে মাজেদা সাবেরের বর্ণনা (রোকেয়া উত্তরসূরী) 'রোকেয়ার ভাইদের সঙ্গে সাখাওয়াতের পরিচয় ছিলো। বিলেতে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত স্ত্রী শিক্ষা ও নারী প্রগতিতে বিশ্বাসী সাখাওয়াতের উদার ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পেয়ে তাঁরা মুগ্ধ হন এবং রোকেয়ার সাথে বিয়ের বিষয়ে উৎসাহী হন। তাঁরা চিন্তা করে দেখলেন সাখাওয়াতের সঙ্গে বিয়ে হলে রোকেয়া তাঁর আরব্ধ কাজ করতে পারবেন। তাঁরা গোপনে সাখাওয়াত সম্বন্ধে রোকেয়ার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করলেন। রোকেয়া তাঁর জীবনের একটা বড় ও মহৎ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য এ বিয়েতে রাজী হলেন।' [৭]

Dhaka University Institutional Repository

যদিও রোকেয়ার বিয়ের সময় পায়রাবন্দের জমিদারির অবস্থা পতনোন্মুখ ছিলো তবুও জমিদার কন্যার বিয়েতে জাঁকজমকের কমতি ছিলোনা।[৮]

রোকেয়ার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে রোকেয়ার উত্তরসূরী মাজেদা সাবের স্মৃতিচারণ করেন— 'সাখাওয়াতের দৈহিক সৌন্দর্য না থাক, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই বিয়ে হয়েছিল সেটা সফল হয়েছিলো। সাখাওয়াত তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের সমস্ত ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছিলেন তার মনের সূক্ষ্ম ও সুকোমল বৃত্তি ও অনুভূতি দিয়ে। রোকেয়ার আরো পড়াশুনার সুযোগ, সাহিত্যচর্চা ও এ দেশের নারীজাগরণে রোকেয়ার কর্মকাণ্ড সবকিছুতেই সাখাওয়াতের আন্তরিকতা ও সমর্থন ছিলো। রোকেয়ার ভেতরের বিরাট সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশে সহায়তা করে রোকেয়ার সাথে সাথে তিনিও এ দেশের নারীজাগরণের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। রোকেয়ার বিবাহিত জীবন ছিলো খুব স্বল্পস্থায়ী'।[৯]

বাংলা সাহিত্য ও সামাজিক ইতিহাসের বিশিষ্ট চরিত্র রোকেয়া "বেগম রোকেয়া" নামে ব্যাপকতর পরিচিতির অধিকারী হলেও তা মোটেই তাঁর প্রকৃত নাম নয়। তাঁর প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন। ইংরেজিতে তিনি স্বাক্ষর করেছেন "Roquiah Khatun" বলে। বলাবাহুল্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বা মিসেস আর এস হোসেন তাঁর বিবাহ পরবর্তী নাম।

জনৈক রাবেয়া খাতুনের অভিভাবকের কাছে প্রেরিত পোস্টকার্ডে রোকেয়ার স্বাক্ষর দেখা যায় R.H. Hossain নামে। বিখ্যাত 'মুসলমান'-এর সম্পাদক মুজিবর রহমানকে রোকেয়া তাঁর 'মতিচূর' (২য় খণ্ড) প্রথম সংস্করণ একখণ্ড উপহার দিয়েছিলেন ৩১.১০.২৩ তারিখে। রোকেয়ার নিজের হাতেরই স্বাক্ষর রয়েছে সেখানে। "R. H. Hossain" নামে।

মোশফেকা মাহমুদ-এর 'পত্রে রোকেয়া পরিচিতি' এবং শামসুননাহার-এর 'রোকেয়া জীবনীতে' রোকেয়ার লেখা যে ২০/২১টি চিঠি ও চিঠির অংশ উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলোর সর্বত্রই রোকেয়া নামই প্রধানত পাওয়া যায়। নিতান্ত ঘনিষ্ঠতাবশতঃ কোথাও লিখেছেন 'রুকু' এছাড়া রোকেয়ার সব রচনায় মুদ্রিত নাম পাওয়া যায় 'মিসেস আর এস হোসেন' অথবা "Mrs. R.S. Hossain" রূপে।[১০]

বিয়ের পরে শিক্ষিত ও উন্নতমনা উদার-হৃদয় স্বামীর সহচর্যে রোকেয়ার কর্মোদ্দীপনা বেড়ে যায়। জনাব সাখাওয়াতও এই প্রখর বুদ্ধিমতি স্ত্রীর সংস্পর্শে এসে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন যে স্ত্রী-শিক্ষা ছাড়া এই হতভাগ্য মুসলিম সমাজের উন্নতি সুদূর পরাহত। তিনি নিজের স্ত্রীর মাঝে লুকানো বিরাট সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশে সকল প্রকার সহযোগিতা করলেন।

সাখাওয়াত সাহেব ছিলেন উচ্চপদস্ত সরকারী কর্মচারী। বিয়ের পর রোকেয়া স্বামীর সাথে দেশের নানা জায়গা ঘুরে বিভিন্ন জাতির সাথে বাস করে ও মিশে সে যুগের মুসলমান সমাজের নারীদের লাঞ্ছনা-

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চনার, অবমাননার যে চিত্র দেখেছেন তাই তাঁর মাঝে জাগিয়েছে নারী শিক্ষা প্রসার ও সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের প্রবল বাসনা। সমাজ সংস্কারে রোকেয়া চালিয়েছেন ক্ষুরধার লেখনী।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর দুটি মেয়ে হয়ে একটি চার মাস এবং অপরটি পাঁচ মাস বয়সে মারা যায়। জীবনের শেষ পর্বে সাখাওয়াত হোসেন দুরারোগ্য বহুমুত্ররোগ ও আনুষঙ্গিক জটিলতায় আক্রান্ত হন। দীর্ঘদিন রোগভোগের ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং স্থায়ীভাবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। চিকিৎসার্থে কলকাতায় অবস্থান কালেই সাখাওয়াতের মৃত্যু ঘটে ৩ মে সোমবার ১৯০৯ সালে।[১১]

মৃত্যুর পূর্বেই সাখাওয়াত হোসেন রোকেয়া যেন ভবিষ্যত জীবনে তাঁর স্বপ্নসাধ পূরণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারেন তার জন্য স্ত্রীকে শুধু পরামর্শই নয়, নিজের সঞ্চয় থেকে দশ হাজার টাকাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।[১২]

স্বামীর মৃত্যুতে নিঃসন্তান রোকেয়ার সব সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন হলো। তিনি এবারে নারী মুক্তিকল্পে সামাজিক কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধনে এবং নারীদের মধ্যে শিক্ষারপ্রসারে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। গভীর শোকের মধ্যেও রোকেয়া দিশেহারা না হয়ে শোককে শক্তিতে পরিণত করেন। সাখাওয়াতের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পরে ৫ জন ছাত্রী নিয়ে ১ অক্টোবর ভাগলপুরের তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়াত শাহ আব্দুল মালেকের সরকারী বাসভবন গোলকুটিতে স্কুলের ভিত্তি পত্তন করেন। সৈয়দ আব্দুল মালেকের চার মেয়ে সৈয়দা কানিজ ফাতেমা, সৈয়দা আমাতুজ জোহরা, সৈয়দা হাসিনা খাতুন (পরবর্তীতে হাসিনা মোর্শেদ নামে পরিচিত) ও সৈয়দা আহসানা খাতুন ছিলেন তাঁর স্কুলের ছাত্রী। এরা সবাই রোকেয়াকে 'স্কুল কি ফুপি' বলে ডাকতেন। পঞ্চম ছাত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়নি।[১৩]

কিন্তু স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যা ও জামাতার হীন দুরভিসন্ধি রোকেয়ার সামনে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। তাঁর হাতের নগদ টাকা ও অলংকারের লোভে স্বামীপক্ষের অন্য আত্মীয়রাও রোকেয়ার জীবনকে বিপন্ন করে তোলে।

সামাজিকভাবে তাঁকে নিন্দিত করার চেষ্টা চলে মিশনারীদের চর বলে। এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার প্রত্যাশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। ছোটবোন হোমায়রা এই দুর্দিনে রোকেয়ার সঙ্গে ছিলেন। তখন ভাগলপুরের কর্মরত বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল মালিকের সহযোগিতায় দুইবোন-রোকেয়া ও হোমায়রা ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে সমর্থ হন। কলকাতায় এসে উঠলেন সৈয়দ আব্দুল মালেকের ছোট ভাই সৈয়দ আব্দুস সালেকের ৩০নং ইউরোপিয়ান এ্যাসাইলাম লেনের বাড়িতে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯১১ সালের ১৬ মার্চ ১৩ নং ওলিউল্লাহ লেনের একটি ভাড়া বাড়িতে মাত্র ৮ জন ছাত্রী ও দু'খানা বেঞ্চ নিয়ে রোকেয়া আবার তার স্কুল শুরু করলেন। ছাত্রী ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারী সৈয়দ আহমদ আলীর মেয়ে আখতারুন্নেছা, মাওলানা মোহাম্মদ আলীর দুই মেয়ে জোহরা ও মোনা, সৈয়দ আব্দুস সালেকের দুই মেয়ে সৈয়দা কানিজ ফাতেমা ও সৈয়দা সাকিনা, ডা: ওহাবের মেয়ে জানি বেগম এবং আব্দুর রবের মেয়ে রাজিয়া খাতুন, অষ্টম ছাত্রীর পরিচয় অজ্ঞাত।[১৫]

কলকাতায় রোকেয়ার সাথে অবস্থানরত তাঁর মা রাহাতুন্নেছা চৌধুরানী ১৯১২ সালে এবং ১৯১৩ সালে পায়রাবন্দে অবস্থানরত তাঁর বাবা পরলোকগমন করেন। ১৯২৪ সালে খলিলুর রহমান আবু জায়গাম সাবের ঢাকায় পরলোকগমন করেন। এর আগে আনুমানিক ১৯০৭ সালে মারা গিয়েছিলেন বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের। বড়বোন করিমুন্নেছা ১৯২৬ সলে ৬ সেপ্টেম্বর মারা যান।

গতানুগতিকতার দেশে রোকেয়া ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্ব। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরেই মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরের খলিফাবাগে রোকেয়া চালু করেছিলেন প্রথম 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়'। বলতে গেলে একটি বিভাষী অঞ্চলের প্রতিকূল সমাজে রোকেয়া তাঁর আন্দোলনের সূচনা করেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধাসাধি করে মেয়েদের নিয়ে এসেছিলেন তিনি।[১৬]

রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মুসলিম নারীদের প্রথম সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম'-এ সংগঠন ভারতীয় নারী অধিকার আন্দোলনে অন্যান্য নারী সংগঠনের সাথে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯১৬ খিস্ট্রাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত এ সমিতি "নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি" ও "Calcutta Mohamedan Ladies Association" নামেও পরিচিতি লাভ করে। অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতিত নারীমুক্তি অসম্ভব। এজন্য এ সমিতি দরিদ্র নারীদের বৃত্তিমূলক ও হস্তশিল্পভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

শুধু উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত নয়, রোকেয়া যে সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত, নিঃস্ব নারী সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ও সমস্যা সমাধানে আন্তরিক ছিলেন– এ সমিতির কর্মকাণ্ড সে কথাই তুলে ধরে।

জীবনের শেষদিকে রোকেয়া সমাজে একজন সমাজকর্মী ও লেখিকা হিসাবে বিশিষ্ট আসন অধিকার করেন। সমকালে রোকেয়ার লেখা মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মন্তব্য স্মর্তব্য—

"বেগম রোকেয়া অবহেলিত প্রতিভা ছিলেন না। জীবতকালে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রায় সব লেখা পাঠকদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং কোন কোন লেখা গুরুতর তর্ক-বিতর্কেরও সৃষ্টি করেছে। তাঁর প্রায় প্রতিটি গ্রন্থই প্রকাশের পরে আলোচনা-সমালোচনার বিষয় হয়েছে।"[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

নারীশিক্ষা বিস্তার ও নারী অধিকার সম্পর্কিত রোকেয়ার লেখা সমকালীন সমাজে যে আলোড়ন তোলে সে সম্পর্কে গবেষক তাহমিনা আলম লিখেছেন,

"সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গালর্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক পূর্ব হতেই বাঙালি মুসলিম সুধী সমাজে বেগম রোকেয়া সুপরিচিত ছিলেন। ১৯০৩-০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অবরোধবন্দিনী নারী জীবনের দুঃখ-বেদনা ও সমস্যার বিভিন্ন দিক ও নারীর ন্যায্য অধিকার সম্পর্কিত বেগম রোকেয়ার প্রবন্ধাবলী বাঙালি মুসলমান সমাজে আলোড়ন তোলে।"[১৮]

বঙ্গের প্রথম নারীবাদী রোকেয়া পশ্চাদপদ, কূপমণ্ডুক, আত্মমর্যাদাহীন জীবন থেকে নারী সমাজকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়েই সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সাহিত্য-চর্চার ইতিহাসও জড়িত। ধ্রুবতারার মত একটি লক্ষ্যের প্রতিই তাঁর সমস্ত কর্ম পরিচালিত হয়েছিল আর সে লক্ষ্য হলো নারীজাগরণ।

**তথ্য সূত্র :**


১। ড. মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান – রংপুর অঞ্চলের জমিদার : রংপুর জেলার ইতিহাস, প্রকাশনায়— জেলা প্রশাসন, রংপুর, প্রথম প্রকাশ – ৩০ জুন, ২০০০, পৃ. ৪৪৯।

২। মাজেদা সাবের : রোকেয়ার উত্তরসূরি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৮, আর ডি আর এস, বাংলাদেশ, পৃ. ৩৭,।

৩। মুহম্মদ শামসুল আলম – রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ ; ডিসেম্বর ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭০।

৪। মোতাহার হোসেন সুফী – বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০১, প্রকাশক : আহমেদ মাহফুজুল হক, সুবর্ণ, পৃ. ১৯।

৫। মুহম্মদ শামসুল আলম – রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ ; ডিসেম্বর ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৯৭।

৬। মোতাহার হোসেন সুফী – বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য : প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০১, প্রকাশক : আহমেদ মাহফুজুল হক, সুবর্ণ, পৃ. ২৩।

৭। মাজেদা সাবের– রোকেয়ার উত্তরসূরি, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি : রোকেয়ার বৈমাত্রেয় ভাই মোহাম্মদ মসিহুজ্জামান আবু ওসামা সাবের : রোকেয়ার উত্তরসূরি, পৃ. ৩০।

৮। ঐ, পৃ. ৩০।

৯। ঐ, পৃ. ৩১।

১০। মুহম্মদ শামসুল আলম – রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ ; ডিসেম্বর ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

১১। শামিমা ইসলাম – বেগম রোকেয়া : অর্জনের ইতিহাস, ২৩, প্রথম প্রকাশ : ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯১ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, পৃ. ২৩।

১২। ঐ, পৃ. ২৩।

১৩। মাজেদা সাবের : রোকেয়ার উত্তরসূরি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৮, আর.ডি.আর.এস, বাংলাদেশ, পৃ. ৩২ ।

১৪। ঐ, পৃ. ৩২।

১৫। ঐ, পৃ. ৩২।

১৬। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১১২।

১৭। আবুল কাসেম ফজলুল হক : রোকেয়া ও উত্তরকাল, আশা-আঙ্ক্ষার সমর্থনে বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৯৩, পৃঃ ১৯৯।

১৮। তাহমিনা আলম : বেগম রোকেয়া : চিন্তা চেতনার ধারা ও সমাজ– কর্ম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

# চিন্তা ও কর্ম

"বাংলার মুসলিম সমাজে এখনও যে যুগ চলিতেছে হিন্দু সমাজের সেই যুগে একজন নারীর জীবনে ও চরিত্রে এমন শক্তি ও সাহস, এমন নিষ্ঠা ও সত্য-পিপাসা বিরল ছিল বলিয়া মনে হয়। নারীকে হিন্দু যে শক্তির আধার বলিয়া পূজা করে, নারী চরিত্রে যে একটি সহজ মহিমা ও শূচিতা আছে, যাহা প্রাকৃতিক শক্তির মত স্বতঃস্ফূর্ত এবং পুরুষের পক্ষে অনেক স্থানেই যাহা সাধনসাপেক্ষ, তাহার পরিচয় পাই এই মহীয়সী নারীর চরিত্র চিত্রে। লতা যেমন আপনিই আলোকের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে, যতই বাধা পাক তবুও সেই দিকেই তাহার গতিপথ— এই নারীর জীবনে সত্য ও সুন্দরের প্রতি একটি অনিবার্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, বাল্য ও বিবাহিত জীবনে তাঁহার সেই প্রাণধর্ম যথেষ্ট অনুকূল আবেষ্টনীর সাহায্য পাইয়াছিল। নানা কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং অশিক্ষাজনিত মনোভাবের বিরুদ্ধ প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাঁহার আত্মা যে স্থানটিতে আরোহণ করিয়াছিল তাহা যে কত সত্য ধ্রুব তাহার এই প্রমাণ পাই যে— আমি বাঙালি হিন্দু ঠিক যে নীতি ও যে ধর্মকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছি এই বাঙালি মুসলিম দুহিতাও ঠিক তাহাকে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, বাঙালি জাতির জাতীয় প্রেরণাই তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছিল। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই প্রেরণা এমন করিয়া একজন নারীকেই আশ্রয় করিয়াছে— বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মা এবং বিবেক-বুদ্ধি এমনভাবে একটি নারী প্রতিমা-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। একালে হিন্দু সমাজেও এমন নারীচরিত্র বিরল। কিন্তু তজ্জন্য হিন্দু আমি কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেছি না: কারণ বেগম রোকেয়া শুধুই মুসলিম মহিলা নহেন, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তিনি খাঁটি বাঙালির মেয়ে।" রোকেয়ার মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বছর পরে বলেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, রোকেয়া মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ১৯৩৭ সালে।

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) বিষয়ে একটি জীবনীগ্রন্থ পাঠ করবার পর। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) ছিলেন তাঁর সমকালের একজন প্রধান সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। মোহিতলাল মজুমদারের রোকেয়া মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আব্দুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্য—

'রোকেয়াকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন দুদিক থেকে— একদিকে রোকেয়াকে বলেছেন "বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মা এবং বিবেক-বুদ্ধির নারী প্রতিমা এবং অন্যদিকে খাঁটি বাঙালির মেয়ে।"[১]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, বাঙালি-মুসলমানের নবজাগরণের এক বিশেষ মুহূর্তে সমাজের একটি ক্ষেত্রে, নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রোকেয়া। বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সমাজ সংস্কারক কর্মী— এই তিনরূপেই তাঁর বিকাশ। বাঙালি, বাঙালি-মুসলমান, নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ— এইসবকে কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

করেই তাঁর ভাবনা আবর্তিত হয়েছে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, নারী-কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা— এইসব তাঁর কর্মের পরিধি। লেখক হিসেবে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেইসবের মধ্য দিয়েও তাঁর একটি আকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; তা হলো নারীজাগরণ তথা সমাজহিত। তাঁর বিকাশ ও কর্মের ক্ষেত্র মূলতঃ তিনটি জায়গায়— রংপুর (বাংলাদেশ), ভাগলপুর ও কলকাতা (পশ্চিম বঙ্গ, ভারত)। দুর্লঙ্ঘ্য পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার আঘাতে অক্ষরজ্ঞানহীন হয়ে থাকাই সেকালে তাঁর জন্যে স্বাভাবিক ছিল— নারী শিক্ষার প্রবর্তন তথা নারীমুক্তি আন্দোলন তো অকল্পনীয়। যে সময়ে বাংলাদেশের নারীরা সামাজিক নিষ্ঠুরতা ও অবিচার এবং স্বজনদের অবহেলায় বিকশিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে অপমানকর জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছিল— রোকেয়া তখন সেসব সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন নিভৃতে। তৎকালীন পুরুষদের মাঝে ব্যতিক্রম ছিলেন দুজন, রোকেয়ার অগ্রজ ইব্রাহিম সাবের ও তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন। অগ্রজের নতুনতর আধুনিক জীবনাদর্শ প্রথম জীবনে রোকেয়াকে প্রস্তুত করে আর দ্বিতীয়জনের ব্যক্তিত্ব, মনন ও অনুপ্রেরণা থেকে রোকেয়া স্বরূপে আবির্ভূত হবার শক্তি পেয়েছেন অনেকটাই। বাংলার প্রথম পাঠ পেয়েছেন তিনি অগ্রজা করিমুন্নেছার হাতে। জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা ও তার সুফলে বাঙালি নারীর সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে রোকেয়া ছিলেন এক স্বতন্ত্র ও বিরল ব্যক্তিত্ব। যাবতীয় প্রতিকূলতাকে নীরবে পরাজিত করে তিলে তিলে রোকেয়া নিজেকে গড়ে তোলেন তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ জীবনাদর্শে। মোহনিদ্রা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় বিভোর জাতিকে জাগরণের মন্ত্র শোনাতে গিয়ে বিপন্ন হয়েছেন রোকেয়া। সঠিক ও নিজ আদর্শে অটল তিনি। উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সমাজের উন্নতি তথা সমাজের মুক্তি নারীমুক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। রোকেয়া সমকালীন সময়ে বাহ্যিক জগত থেকে বাঙালি নারীকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নানামুখী তৎপরতা বিদ্যমান ছিল। যা নারীর অন্তঃপুরীয় দাসত্ব কায়েম রাখা এবং পুরুষতান্ত্রিকতার প্রবাহকে প্রবলতর করার জন্য ক্রিয়াশীল ছিল। এতে করে দীর্ঘকালীন অনভ্যস্ততা ও অপ্রচলনের কারণে নারীরাও ঘরের বাইরে কাজে আগ্রহ দেখাতো না। তৎকালীন বাঙালি সমাজে জমিদার তথা শাসকশ্রেণী উৎপাদন সম্পৃক্তিহীন হয়েও প্রধান ভোক্তা ছিল— যা বরাবর রয়ে গেছে এবং রয়ে গেছে উৎপাদক শোষিতশ্রেণীর প্রতি ক্রমাগত বঞ্চনা। সামাজিক বৈষম্যের মূলে রয়েছে উৎপাদন সম্পৃক্তিহীনতা এবং সম্পৃক্তির স্তরভিন্নতা; ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষেই শুধু নয়— শাসকশাষিতের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ইতিহাসের সমান বয়সী বা প্রগৈতিহাসিককাল পর্যন্ত এর বয়স বিস্তৃত। পৃথিবীতে সংঘটিত নানা আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন এসেছে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও বিশেষভাবে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জীবনে। আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগ পুরুষ গ্রহণ করেছে সর্বতোভাবে সম্পূর্ণটুকুই। নারীকে তার অধিকার আদায় করে নিতে হয়েছে প্রভু পুরুষের নিকট থেকে। প্রসঙ্গতঃ নারী যে মানুষ এ স্বীকৃতিই পুরুষের নিকট থেকে আদায় করতে হয়েছে অতীত সময়ে। নারীকে সামাজিক, ধর্মীয় বিধি-বিধানের জালে, প্রথার

Dhaka University Institutional Repository

শিকলে বন্দী করে রাখা হয়েছে পিতা-স্বামী-পুত্রের সংসারে। তার সকল শ্রম চার দেয়ালে আবদ্ধ; তার শ্রমের মাহাত্ম্য বাইরের পৃথিবীতে আসতে পারে না। নারীর উপর সামাজিক ভণ্ডামি, অবিচার প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মেয়ে শিশুকে শৈশব থেকে প্রয়োজনীয় অনাধুনিক অসহ্য নিয়মের জালে জড়িয়ে গড়ে তোলা হতো যাতে তার গায়ে মুক্ত সূর্যের আলো লাগতে না পারে। নারীকে গড়ে তোলা হতো বিয়ের উপযোগী করে ঘরকন্যার কাজ শিখিয়ে। পুরুষতন্ত্রের মানসিকতায় বিবাহই নারীর নিয়তি ও জীবিকা অর্জনের উপায়, বলা চলে চাকরি। আর কোন উপায়ে নারী উপার্জনের চেষ্টা করলে সে হবে সমাজদ্রোহী— পুরুষতন্ত্রের এ ধারণার মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে রোকেয়া বলেন, "ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কাঁদিয়া মর কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও নিজের অন্নবস্ত্র নিজেই উপার্জন করুক" (স্ত্রী জাতির অবনতি)।

নারীকে তার অবমাননাকর অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য নারীর স্বাধীন শ্রম বা উপার্জন করা ব্যতীত অর্থাৎ নারী স্বাধীনতার জন্য তার অর্থনৈতিক মুক্তির বিকল্প নেই— এ অকাট্য সত্য উপলব্ধি করেই রোকেয়া নারীর স্বাধীন শ্রম নিয়োগ, স্বাধীন উপার্জনের কথা বলেছেন, "যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারি না।" (স্ত্রীজাতির অবনতি)

বাঙালি নারীর যাবতীয় দৈন্য ও দুর্গতির অন্যতম কারণ স্ত্রী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা। আত্ম-চেতনায় বলীয়ান, কর্মে বিশ্বাসী, সংগ্রামী রোকেয়া নারীদেরকে মুক্তি আন্দোলনে আহ্বান জানান। নারী শিক্ষার প্রবর্তন ও তার সুফল লাভই রোকেয়ার মতে এ আন্দোলনের প্রথম ধাপ। আর তাই ১৯০৯ সালের অক্টোবর মাসে মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে রোকেয়া ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' স্থাপন করেন, পরে যা কলকাতার ওয়ালিউল্লাহ লেনে স্থাপন করা হয়। রোকেয়া নিজের সুখ্যাতি বা স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে স্কুলের এ নামকরণ করেননি নারীহিত তথা সমাজহিতই ছিল রোকেয়ার লক্ষ্য।

এ প্রসঙ্গে একজন শুভানুধ্যায়ীকে (তোসাদ্দক সাহেব) লিখিত একটি চিঠিতে রোকেয়া বলেন, "ভাই সাহেব আপনি ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবেন না যে, আমার শ্রদ্ধেয় স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্যেই আমি স্কুল আঁকড়ে পড়ে আছি। গভর্মেন্ট এই স্কুলের নতুন নামকরণ Government H.E. School for Muslim Girls অর্থাৎ মুসলিম বালিকা উচ্চ ইংরেজি সরকারী বিদ্যালয় করতে চেয়েছেন তাতে আমি মুহূর্তেই রাজী হয়েছি। চিরকাল আমি স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য কিছু করবার চেষ্টা করেছি।" (মোশফেকা মাহমুদ : পত্রে রোকেয়া পরিচিতি; সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ.-৩০, প্রথম প্রকাশ– ১৯৬৫।)

নারীদের শিক্ষিত, সচেতন করবার রোকেয়ার এ প্রয়াস যে সমাজে অভিনন্দন লাভ করবে না বরং কূপমন্ডুক সমাজের অকর্মণ্য অংশের শিক্ষালাভের এ অভিলাষ সমাজপতিদের যে প্রথমত বিস্মিত করবে, এবং তারপর পরই তারা যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এবং আন্দোলনকারীদের সদিচ্ছাকে নস্যাতের

Dhaka University Institutional Repository

অপচেষ্টা করবে এ ব্যাপারে রোকেয়া ছিলেন সচেতন। কিন্তু রোকেয়ার মতে এতে সাহস হারানো বা পিছু ফেরার কোন যুক্তি নেই। ইতিহাস প্রাজ্ঞ রোকেয়া পূর্বসূরী সমাজ সংস্কারকদের উদাহারণ টেনে– মহাত্মা গ্যালিলিরও-র দৃষ্টান্ত দিয়ে, পারস্য ও পশ্চিমা নারী সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা জয় করার দৃঢ় মনোবল লালন করেন।

যথার্থ পরিকল্পনা, সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিরাচরিত অত্যাচার-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রোকেয়ার এই সংগ্রাম সার্থকতা পেয়েছিল। সমাজের উন্নয়নের স্বার্থেই ছিল তাঁর এ আন্দোলন। রোকেয়ার আন্দোলন ছিল নারী-পুরুষ বিভেদহীন সমাজ গড়ার আন্দোলন। নারী মুক্তির বৃহৎ আন্দোলন শুধু স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারেই সম্ভব নয়— তার জন্যে প্রয়োজন সমাজে নারীকে মর্যাদার আসনে বসানো, এ উপলব্ধি থেকে তিনি তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক তৎপরতা দিয়ে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" বা "মুসলিম মহিলা সমিতি"। এ সমিতির কাজ ছিল বহুমুখী, তবে স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষাদান ছিল আঞ্জুমানের প্রধান লক্ষ্য। এ সমিতি ভিখারী ও অক্ষমের দুর্বল হাতকে কর্মীর দৃঢ় হস্তে পরিণত করেছে। এ সমিতি থেকেই পরবর্তীকালের নারীমুক্তি আন্দোলনকারীরা প্রস্তুত হয়ে আসেন। শামসুন নাহার, সুফিয়া কামাল ও আনোয়ারা বাহার চৌধুরী প্রমুখ এ সমিতির উত্তরাধিকারী।

বেগম রোকেয়া ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ। যিনি তাঁর সমগ্র কর্মজীবন নিবেদিত করেছিলেন তাঁর আদর্শ ও চিন্তা-চেতনাকে বাস্তবায়িত করতে।

গবেষক তাহমিনা আলমের মতানুসারে–

"তাঁর কর্মজীবন বিংশ শতাব্দীতে আরম্ভ হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেঁনেসাসের জ্ঞানের আলোক, মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিবাদ ও উদারতা তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কর্মজীবনকে উদ্ভাসিত করেছিল। আর এ বিচারে বেগম রোকেয়া ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সূচিত রেনেসাঁসের একজন উত্তরাধিকারী। বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজে তিনিই ছিলেন মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তক। উদ্যম, ত্যাগ, কঠোর কর্মনিষ্ঠা, মুক্তবুদ্ধি, চিন্তা ও সৃজনশীলতার বলে তিনি তাঁর জীবন ও সময়কালের পারিপার্শ্বিকতার অনেক উর্ধ্বে উঠে এবং সমগ্র বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা দূরে সরিয়ে বাঙালি মুসলিম নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করতে সমর্থ হন। একজন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজসংস্কারক হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদে বিশ্বাসী রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাথে তুলনীয়। ইতিহাসের বিচারে আমরা বেগম রোকেয়াকে প্রথম আধুনিক বাঙালি মুসলিম নারীরূপে অভিহিত করতে পারি। কারণ আধুনিকতা বলতে

Dhaka University Institutional Repository
আমরা বুঝি প্রগতিশীলতা, মুক্তচেতনা, সামাজিক ন্যায়বোধ, মানবতাবোধ ও সংগ্রামী চেতনা— যা রোকেয়ার মাঝে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত।"[২]

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের মাধ্যমে মুসলমান নারী সমাজে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলনই ছিল রোকেয়ার ঐকান্তিক কামনা। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং গতানুগতিকতার উর্ধ্বে। শিক্ষা সম্পর্কে রোকেয়া বলেন 'শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ।' (স্ত্রীজাতির অবনতি, মতিচূর ১ম খণ্ড)

রোকেয়া জীবনের ব্রত ছিল নারীমুক্তি। আর নারীমুক্তি তখনই সম্ভব যখন নারী হবে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল। আর শিক্ষাই পারে অধঃপতিত নারীকে উন্নত করতে। আর তাই তিনি দুই দশকের অধিককাল নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন নারীশিক্ষা বিস্তারে। রোকেয়া বলেন,"শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি, গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি তাই চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে.....শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক উভয়বিদ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ি-ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালংকার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই। তাহাদের জীবন শুধু পতি দেবতার মনোরঞ্জনের জন্য উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।" (সুবেহ সাদেক)

অন্ধবিশ্বাসে আবিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পশ্চাদপদ এক সমাজে জন্মগ্রহণকারী রোকেয়ার চিন্তা ও কর্ম স্বকিয়তায় বৈশিষ্টমণ্ডিত– বিস্ময়কর। সময়ের চেয়ে সহস্র বছর অগ্রগামী রোকেয়া পায়রাবন্দের রক্ষণশীল জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও নিজের আগ্রহাতিশয্যে এবং বড় ভাইয়ের অনুপ্রেরণায় বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। বিয়ের পরে সৌভাগ্যক্রমে স্বামীর মধ্যে তিনি লাভ করেন এক মুক্তবুদ্ধির মানুষকে। তাঁর প্রেরণায় তিনি শিক্ষা দীক্ষার পথে অগ্রসর হন এবং সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন (Sultana's Dream এবং মতিচূর (প্রথম খণ্ড) এ সময়ের রচনা)। কিন্তু স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের অকাল মৃত্যুতে তাঁর পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এরপরে রোকেয়া অগ্রসর হন নারীমুক্তি সাধনের লক্ষ্যে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে এবং নারী সংগঠন সৃষ্টিতে। স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল', লেখেন মতিচূর (২য় খণ্ড), পদ্মরাগ ও অবরোধবাসিনী এবং "আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম" নামে গঠন করেন মুসলমান মহিলাদের একটি সংগঠন।

Dhaka University Institutional Repository

নারী মুক্তি– লক্ষ্যকে উদ্দীষ্ট করেই রোকেয়ার সকল কর্ম পরিচালিত। এমনকি রোকেয়ার লেখালেখিও এ উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। গবেষক লায়লা জামান এর ভাষায়–

"রোকেয়ার রচনাবলী প্রধানতঃ সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী রোকেয়ার মত প্রকাশের বাহন।"[৩]

স্কুল বিষয়ে রোকেয়ার মনোভাবের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন গবেষক শামসুল আলম–

'রোকেয়ার কাছে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল শুধু একটি বিদ্যালয় মাত্র ছিল না— এটা ছিল তাঁর স্বপ্ন পূরণের আঁধার, বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের সূতিকাগার। রোকেয়া দেখেছিলেন, বাঙালি নারীর যাবতীয় দৈন্য ও দুর্গতির একমাত্র কারণ স্ত্রী-শিক্ষর প্রতি উদাস্য, এই উপলব্ধি থেকেই রোকেয়া একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার পথে অন্তরায়সমূহ বিদূরিত করার চেষ্টা করেছেন। মৌল ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলোর সাথে প্রচলিত গতানুগতিক সংস্কারান্ধতার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তিনি। স্বীয় জীবনাচারণের মাধ্যমে উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ স্থাপন করেছেন, সর্বোপরি নারীর মানবিক অস্তিত্বের অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছেন তিনি। এই বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতা মিশনারি বিদ্যালয় কিংবা কলকাতার অন্য কোন হিন্দু বিদ্যালয় থেকে স্পষ্টতঃ পৃথক ছিল। প্রগাঢ় উদারতা ও মানবিক প্রজ্ঞাবশত রোকেয়া তাঁর বিদ্যালয়ে সকল ধর্মাবলম্বী ছাত্রী গ্রহণ করেছেন।'

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করে এ কে ফজলুল হক বলেন, "The School she founded thought largely attended by Mussalman girls, he was non-sectarian in character"[৪] ।

সাখাওয়াত মোমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করার পর প্রায় দুই যুগ রোকেয়া তাঁর সকল শক্তি ও সাহস ব্যয় করেন এই নারী শিক্ষায়তনের পরিকল্পনা ও পরিচালনায়। শৈশব থেকে নারী সমাজের যে সব দুর্গতি তাঁকে পীড়িত করেছিল— "তার অবসান কল্পেই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন নারীকে সুশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলায় ব্যয় করেন।"

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের শুরুতে সৈয়দ আহমদ আলীকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১১ খ্রিঃ ২ এপ্রিল এই কমিটি দাতার নামে স্কুলের নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্কুল প্রতিষ্ঠার আট মাস পরে বার্মা ব্যাঙ্ক ফেল করলে স্কুলের গচ্ছিত সমুদয় অর্থ খোয়া যায়। স্কুলের এই আর্থিক দুর্দিনে রোকেয়া তাঁর ব্যক্তিগত অর্থ স্কুল তহবিলে দান করেন এবং পরবর্তী সারা জীবন-ই রোকেয়া তাঁর ব্যক্তিগত অর্থ স্কুল ফান্ডে দান করেছেন, এমনকি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে প্রাপ্য সম্মানীও তিনি স্কুল ফান্ডে দান করতেন।

প্রথমদিকে স্কুল পরিচালিত হতো জনসাধারণের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে। জনগণের তরফে স্কুল সাহায্য পেয়েছে প্রথমে বোম্বের পরলোকগত মিঃ মালাবারী ও কলকাতার মরহুম নওয়াব বদরুদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

হায়দারের কাছ থেকে। পরের বৎসর (১৯১২) মিঃ মালাবারী হিজ হাইনেস দি আগাখানের কাছ থেকে স্কুলের জন্য ৩০০/- টাকা সংগ্রহ করেন এবং লেডি হার্ডিঞ্জের মারফত পাঠান। পরিচালনা কমিটির সদস্যরা ১৯১১ সালের আগস্ট থেকে ১৯১৪ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাসিক চাঁদা দিয়ে স্কুলকে সাহায্য করেন। স্যার এ. কে গজনভী প্রতি মাসে ১০/- টাকা করে সাহায্য দিয়েছেন।[৫]

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল দ্বিতীয় বছরে ৭১/- টাকা সরকারী সাহায্য লাভ করে। দুই বৎসর পরে ১৯১৪ সালে সাহায্যের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই বছর ৪৪৮ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। ১৯১৪ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত সাহায্যের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। ১৯২৫ সালে ৫৫০/- টাকা পাওয়া যায় এবং ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫০/- টাকায়।[৬]

রোকেয়ার অবিচ্ছিন্ন প্রয়াসে ১৯১৫ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে উন্নীত হয়। ১৯২৭ সালে সপ্তম শ্রেণী খোলা হয়। ১৯৩১ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল-এর তিনজন ছাত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।[৭]

সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে উচু ক্লাস খোলার ফলে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব দেখা দেয়। রোকেয়া স্কুলের উন্নতির জন্য শিক্ষয়িত্রীদের প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ১৯১৯ সালে কলকাতায় "মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮]

স্কুলের প্রতি রোকেয়ার আন্তরিকতার প্রমাণ মেলে তাঁর চাচাত বোন মোনাকে লেখা একটি চিঠি থেকে, "আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমার কাসন্দ পেয়ে সুখী হয়েছি বুয়া! তুমি কাসন্দ না দিয়ে যদি স্কুল ফান্ডে চার /পাঁচ টাকা পাঠাতে তাতে আমি বেশী সুখী হতুম।

এক ব্যক্তি সুদূর রেঙ্গুন থেকে স্কুলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছেন— গতমাসে ২৭ টাকা পাঠিয়েছিলেন, এবার ৬৯/- টাকা পাঠিয়েছেন। আর তোমরা আমার আপন লোক হয়ে স্কুলটাকে ভুলে থাক।"[৯]

ছাত্রীদের অনেকেই লেখাপড়া করত বিনা বেতনে। কেউ কেউ পড়ত নামমাত্র বেতন দিয়ে। এ সমস্ত সুযোগদান করেও ছাত্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন মুসলিম পরিবারে গিয়ে অনুরোধ জানাতেন। যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া মওকুফ করা হত অনেক মেয়ের।[১০] এখানে উল্লেখ্য যে, রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি কলকাতার প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে খ্রীস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন সূচিত হয়। বিশেষভাবে মিসেস মেরী এ্যানকুক (পরে মিসেস উইলসন)-এর আন্তরিক প্রয়াসে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ১৮২১ সালের পরবর্তী আট বছরে আটটি স্কুল খোলা হয়। ১৮২২ সালের মধ্যেই এসব স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ২১৭তে গিয়ে পৌছায়। সে সময়ে কলকাতার শ্যামবাজার এলাকার একজন মুসলমান মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

মেরী এ্যানকুকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮টি বালিকা নিয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ঐকান্তিক আগ্রহে ছাত্রী সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে পঁয়তাল্লিশ-এ উন্নীত হয়েছিল। এন্টালি ও জানবাজারের স্থানীয় মুসলমানরাও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবার বেগম ফেরদৌস মহল কলকাতা শহরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজ্ঞ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মা খুজিস্তা আখতার বানু সোহরাওয়ার্দী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভিন্ন দিকে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের উচ্চভিলাসী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। ১৮৮৬-৮৭ পর্যন্ত সম্মিলনীর উৎসাহী কর্মিগণ স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের অব্যাহত প্রয়াস চালু রেখেছিলেন নানাভাবে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের কোনটিই দীর্ঘ জীবন লাভ করতে সমর্থ হয়নি।

১৮৭৩ সালে রোকেয়ার জন্মেরও প্রায় সাত বছর আগে কুমিল্লা পশ্চিমগাঁও-এর নবাব ফয়েজুন্নেছার (১৮৪৭-১৯০৩) আগ্রহ ও অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ফয়েজুন্নিসা বালিকা বিদ্যালয়।'[১১]

বাংলার মুসলমান সমাজের নারীদের উন্নতিকল্পে তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই বেগম রোকেয়া স্কুল স্থাপন করেন। রোকেয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন উদার হৃদয় ব্যক্তি ব্যারিষ্টার জনাব আবদুর রসুলের গৃহে সমবেত হয়ে স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন। স্কুলের বিষয়ে সেদিন সমাজের বৃহত্তর অংশ তাঁকে অভিনন্দিত করার বদলে লাঞ্ছনা ও উপহাস করে তাঁর জীবনকে তিক্ততায় ভরিয়ে দিয়েছিল। যুবতী বিধবা স্কুল স্থাপন করে নিজের রূপ যৌবনের বিজ্ঞাপন করছেন— এই ধরনের অপবাদ দিতেও সেদিনের সমাজ পিছপা হয়নি।[১২]

রোকেয়া তাঁর স্কুলে মেয়েদের গান ও ব্যায়াম শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আবার স্কুল পরিচালনা করার জন্য নিজেকে তৈরি করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন মেয়ে স্কুলে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে স্কুলের পরিচালনা দেখেছেন এবং শিখে নিয়েছেন। এই সূত্রে নারী-শিক্ষা মহলের প্রধান প্রধান নেতাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর। বস্তুতঃ পড়াশোনা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রি না থাকায় স্কুল নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় অসুবিধায় পড়তে হতো তাঁকে। সে-জন্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হয়েছিলেন রোকেয়া।

আবার কলকাতা থেকে অনেক দূরের বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব ডিগ্রিধারী মেয়েদের নানান যোগাযোগের মাধ্যমে রোকেয়া তাঁর স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, তাদেরও তৈরি করে নিতে হতো তাঁকে। সারা সপ্তাহ স্কুলের কাজ করে শনিবার সন্ধ্যায় তিনি পড়তে যেতেন রাজকুমারী দাসের কাছে। অঙ্ক শিখতে যেতেন রেজাউর রহমান খানের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজের চাপে তাঁর আর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। শুধু কলকাতার মেয়েরাই নয়, মফস্বলের মেয়েরাও যাতে স্কুলে পড়তে পারে সে জন্য স্কুলের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা করেছিলেন রোকেয়া। পনের জন ছাত্রীর পরিবর্তে পেলেই বোর্ডিং খোলা হবে, এই মর্মে রোকেয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছিলেন আঠার মাস ধরে । তাঁর পর অন্তত ছয়জন মেয়ের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। কিন্তু মাত্র একজন ছাড়া ছাত্রী না আসায় বোর্ডিং চালু করতে পারেন নি রোকেয়া। অবশ্য যখন স্কুলের বেশ নাম হয় তখন বোর্ডিংও চালু হয়। রোকেয়া কোলকাতার বাইরে গেলে ছোটবোন হোমায়রা বোর্ডিং পরিচালনার দায়িত্ব নিতেন।[১৩]

একবার স্কুলের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রীদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, "এক সময় রবিবারে স্কুল কমিটির একটি মিটিং হইবার কথা ছিল। তাহার পূর্ববর্তী শুক্রবার সন্ধ্যায় স্কুলের সেক্রেটারী উক্ত মিটিং সংক্রান্ত কতগুলি জরুরি কাগজ লইতে আসিয়া শুনিলেন তোমাদের সেই দীনতমা সেবিকার মাতার মৃত্যু হইয়াছে— লাশ তখনও ঘরে। তিনি নীরবে ফিরিয়া গেলেন, আর ভাবিলেন যে, মিটিংটা পণ্ড হইল। পরদিন মাতার দাফনক্রিয়া শেষ হওয়ামাত্র সে সর্বপ্রথমে সেই কাগজগুলি সেক্রেটারির নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল।"[১৪]

প্রগতিশীল, মুক্তবুদ্ধির অধিকারী, চিন্তা-চেতনায় বিপ্লবী বেগম রোকেয়া স্কুলের স্বার্থে, বৃহত্তর মুসলিম নারী সমাজের জাগরণের স্বার্থে, পর্দা প্রশ্নে সমাজের সাথে আপোষের পথই বেছে নিয়েছিলেন। লক্ষ্য পূরণের স্বার্থে এ ছিল তাঁর মহান আত্মত্যাগ। পর্দা প্রশ্নে তাঁর মনোভাবের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠে সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দিনের সাথে এক সাক্ষাতকারে এ উক্তিতে "পর্দা মানে অবরোধ নয়, কিন্তু আমি যে অনিচ্ছাকৃতভাবে অবরোধবাসিনী হয়েছি তার কারণ অনেক। আমার স্কুলটা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি সমাজের অযৌক্তিক নিয়ম কানুনগুলোও পালন করছি। অবস্থা এরূপ— এখন যে আমি পর্দার আড়ালে থেকে আপনার সাথে কলা বলছি, এটাও হয়তো দূষণীয় হয়ে পড়বে। আমি বাড়িতে বাড়িতে ক্যানভাস করে মেয়ে আনতে যাই, কিন্তু অভিভাবকরা আমাকে আগেই জিজ্ঞেস করেন, পর্দা পালন করা হয় কিনা? এতটুকু ছোট মেয়ের বেলায়ও এই প্রশ্ন! এখন বুঝুন, কি পরিস্থিতির মধ্যে আমি স্কুল চালাচ্ছি আর ব্যক্তিগতভাবে আমার অবস্থাটাই বা কিরূপ? স্কুলের জন্য আমি সমাজের সব অবিচার-অত্যাচার সহ্য করে চলেছি। আপনি মহিলা সংখ্যা সওগাতে ছাপার জন্য আমার ছবি চেয়েছিলেন কিন্তু এ সব কারণেই দিতে পারিনি। আপনি যেভাবে সওগাতের মাধ্যমে মেয়েদের জাগিয়ে তুলছেন, তাতে এসব কুসংস্কার অনেকটা দূর হবে বলে আশা করি। সেদিন আমিও হয়তো সাহিত্যিক ও সমাজ কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ এবং আলাপ আলোচনা করতে পারবো"[১৫]— এই ছিলো রোকেয়ার সত্যিকারের মনের কথা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নতির স্বার্থে নিজের ব্যক্তিগত ভাললাগা/মন্দ লাগাকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি।

জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত রোকেয়া স্কুল পরিচালনার কাজে অবরোধের অত্যাচার সয়েছেন। ২৮ জুন ১৯২৯ সালের ঘটনা— "স্কুলের একটি মেয়ের বাবা রোকেয়ার কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে, মোটর বাস

Dhaka University Institutional Repository

তাহার গলির ভিতর যায় না বলিয়া তাহার মেয়েকে বোরকা পরিয়া চাকরাণীর সহিত হাঁটিয়া বাড়ি আসিতে হয়। গতকাল এক ব্যক্তি চায়ের পাত্র হাতে লইয়া যাইতেছিল, তাহার ধাক্কা লাগিয়া হীরার (তাহার মেয়ের) কাপড়ে চা পড়িয়া গিয়া কাপড় নষ্ট হইয়াছে।" রোকেয়া চিঠিখানা একজন শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিয়ে এর তদন্ত করতে বলেন। তিনি ঘটনার যে বিবরণ দেন তাহলো হীরার, বোরকায় চক্ষু নাই। বোরকায় চক্ষু না থাকায় হীরা ঠিকমত হাঁটিতে পায় না, কখনও বিড়ালের গায়ে ধাক্কা খায়, কখনও হোঁচট খায়। গতকাল হীরাই সে পাত্রবাহী লোকের গায়ে ধাক্কা দিয়া তাহার চা ফেলিয়া দিয়াছে।" হীরার বয়স মাত্র ন' বছর। এতটুকু বালিকাকে অন্ধ বোরকা পড়ে পথ চলতে হয়।[১৬]

স্কুলের প্রথম মোটরবাস তৈরি হবার পরে কেউ কেউ এর নাম দিয়েছিলেন (Moving Black hole) বা 'চলন্ত অন্ধকূপ'। এমন বাসে যাতায়াত করতে গিয়ে ছোট মেয়েরা ভয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিল, কেউ কেউ বাসেই বমি করেছিল।

আবার কোন কোন ছাত্রী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ফলে বাসের দু'পাশের দুইটি খড়খড়ি নামিয়ে দিয়ে দুই খণ্ড কাপড়ের পর্দ্দা দেওয়া হলো। এর ফলে পরদিন রোকেয়া চারিখানা ঠিকানাহীন ডাকের চিঠি পেলেন। সকল চিঠির বিষয় একই "সকলেই দয়া করিয়া স্কুলের মঙ্গল কামনায় লিখিয়াছেন যে, মোটরের দুই পার্শ্বে যে পর্দ্দা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাতাসে উড়িয়া গাড়ী বেপর্দ্দা করে। যদি আগামীকল্য পর্যন্ত মোটরে ভাল পর্দ্দার ব্যবস্থা না করা যায়, তবে তাহারা ততোধিক দয়া করিয়া 'খবিস', 'খালিদ' প্রভৃতি উর্দ্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রটনা করিবেন এবং দেখিয়া লইবেন এরূপ বেপর্দ্দা গাড়িতে কি করিয়া মেয়েরা আসে।" —

বড় দুঃখে রোকেয়া বলিয়াছেন, "এতো ভারী বিপদ; না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।" রাজার আদেশে একদিন নয়, দুদিন নয়— দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বোধহয় কেহ এমন করিয়া জীবন্ত সাপ ধরিতে পারে নাই।[১৭]

স্কুলের স্বার্থেই রোকেয়া ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভাললাগা, মন্দলাগা বিসর্জন দিয়েছিলেন। স্কুলের স্বার্থেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পর্দা প্রশ্নে নিজের বিবেকের অনুশাসন মেনে চলতে পারেননি। স্কুলের মঙ্গলের দিকে চেয়ে রোকেয়া এ ব্যাপরে সমাজের সবচেয়ে গোঁড়া মানুষদের মতামতকেও মেনে চলতেন। এ জন্য তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও বহু পরিমাণে খর্ব হতো। কিন্তু তিনি যদি এত সতর্কভাবে অগ্রসর না হতেন তা হলে বোধ হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল বহুদিন আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এবং মুসলমান নারীর উন্নতিও পিছিয়ে যেত শত বছর।

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়া একদিন কথাচ্ছলে বলেছিলেন, "ক্ষুদ্র জীব মাকড়সা তাহার নিজের বুকের রক্তে শতশত মাকড়-শিশুকে নতুন জীবন দেয়, আর আমরা মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, আমরা কি কেহ এই রূপ একটি প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শত শত মুসলিম নারীর মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত করিতে পারি না।"[১৮]

রোকেয়ার জীবনব্যাপী আত্মত্যাগের ফলেই জেগে উঠেছে পরবর্তী প্রজন্মের বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ। তাইতো শিষ্য শামসুননাহার অভিহিত করেছেন রোকেয়াকে 'মাকড় মাতা' বলে।

রোকেয়া চব্বিশ বছর (১৯০৯-৩২) অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিচালনা করেছেন। বস্তুত স্কুল প্রতিষ্ঠার পর এটিই ছিলো তাঁর দিনরাত্রির ধ্যান জ্ঞান।

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার পরেও রোকেয়ার মনে দুঃখ ছিলো স্কুলটির একটি বাংলা শাখা খুলবার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না বলে।

রোকেয়া নারীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছেন। সুশিক্ষা বলতে তিনি ঘরের কাজ (সুগৃহিনী)। এবং বাইরের কাজ (এখন পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব) দুদিকেই সমান পারদর্শী হয়ে ওঠার উপরে জোর দেন। বিশেষ করে নারীদের ঘরের কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে করার জন্যও যে সুশিক্ষার প্রয়োজন সে ব্যাপারে বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। রোকেয়ার এ মনোভাব পশ্চাদপদ সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ (সুমাতা, সুগৃহিনী সৃষ্টি) নয় বরং মূল লক্ষ্য (নারীমুক্তি) পূরণের জন্য কৌশলী রোকেয়র আপাত সমঝোতা। রোকেয়ার "Badge of Slavery" "মুক্তিফল" "পদ্মরাগ" "সুলতানার স্বপ্ন"–ইত্যাদিতে রোকেয়া মানস স্বদ্বীপ্তিতে উদ্ভাসিত। পুরুষ চরণাশ্রিত গৃহিনী নারী নয়– আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন, মুক্তমনা নারীই রোকেয়ার প্রত্যাশিত স্বপ্ন। এ স্বপ্ন পূরণের লক্ষেই রোকেয়া জীবন নিবেদিত।

শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল দুই যুগের মধ্যে একটি আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সমাজের পশ্চাদপদ অংশের শত বাধা থাকলেও রোকেয়া কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীও পেয়েছিলেন। রোকেয়ার গুণগ্রাহী ও পরামর্শক হিসেবে তৎকালীন বিশিষ্ট মহিলাদের মধ্যে ছিলেন ভূপালের বেগম সুলতান জাহান, মিসেস পি. কে রায়, মিসেস হাকান, মিসেস সাকিনা চৌধুরী, এম. এ, দুই বড় লাটের পত্নী— লেডী চেমসফোর্ড ও লেডী কারমাইকেল। ১৯১৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সর্বজন শ্রদ্ধেয়া সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) একটি দীর্ঘ ব্যক্তিগত পত্রে রোকেয়াকে তাঁর নিঃস্বার্থ সমাজসেবা ও অসাধারণ শিক্ষানুরাগের জন্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা নিবেদন করে লেখেন–

"Will you allow a stranger like me to write and tell you from my sick bed how greatly I have sympathised with your brave work for several years and

Dhaka University Institutional Repository

how deeply I have admired your self. Sacrifice and devotion in not only founding but so ably sustaining your work of education for Muslim girls. Need I say how proud I am, when any sister of mine, Hindu or Muslim comes forward to do such patriotic work". [১৯]

১৯১৩ সালের ৯ মে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল স্থানান্তরিত হয় ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনের (বর্তমান কমরেড আবদুল হালিম লেন) একটি বাড়িতে। এখানে তুলনামূলকভাবে ভালো বাড়ি পাওয়া গেলেও পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান না হওয়ায় এবং যোগ্য শিক্ষিকা ও শিক্ষাপোকরণের অভাবে মফঃস্বলের মেয়েদের ইচ্ছানুরূপ ভর্তির সুযোগ দেয়া সম্ভব না হওয়ায় আবার ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয় ৮৬/এ, লোয়ার সার্কুলার রোডের একটি দ্বিতল বাড়িতে।[২০]

কিন্তু আমৃত্যু রোকেয়া চিন্তিত ছিলেন স্কুলের একটি নিজস্ব গৃহ না থাকা নিয়ে। কলকাতা শহরে নিজের জন্য একখানা বাসগৃহ তৈরির কথা ভাবেননি তিনি কোনদিন। বিভিন্ন সময়ে স্কুল গৃহেই তিনি বসবাস করেছেন প্রধানতঃ স্কুলের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনে। লোয়ার সার্কুলার রোডের দ্বিতল গৃহের একটি কক্ষেই তিনি আমৃত্যু বাস করেছিলেন।[২১]

রোকেয়ার জীবনের মতোই রোকেয়ার চিঠিপত্রের সমস্তটাই জুড়ে থাকত তাঁর স্কুল বিষয়ক ভাবনা-বেদনা। ১৯১৫ এবং ১৯৩০ সালে লেখা দুটি চিঠির উদ্ধৃতাংশ থেকে বোঝা যায়, এই দীর্ঘ সময় পরিসরে তাঁর চিন্তার সমস্তটাই জুড়ে ছিল তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

১। "চিঠি না লিখিবার একমাত্র কারণ সময়াভাব। বুঝিতেই পার, এখন খোদার ফজলে পাঁচটি ক্লাস এবং ৭০টি ছোট বড় মেয়ে, দু'খানা গাড়ী, দুই জোড়া ঘোড়া, সইস, কোচম্যান, ইত্যাদি সর্বদিকে একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়।"

২। "তুমি অমন আদর করে যেতে বলেছ। কিন্তু বোন গ্রীষ্মাবকাশে আমার তো কোথাও যাবার জো নেই। এই যে স্কুল সংক্রান্ত রাশীকৃত অফিস ওয়ার্ক এগুলো করবে কে? সুতরাং বেহেশতের নিমন্ত্রণ পেলেও তো স্কুল ছেড়ে যেতে পারব না।"[২২]

বাস্তবিকপক্ষে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ছাত্রী সংগ্রহ, ঘোড়া ও গাড়ীর সংস্থান এবং নিয়মিত তত্ত্বাবধান, আর্থিক ব্যবস্থাপনার মতো নৈমিত্তিক গুরুভার রোকেয়াকে একাকীই বহন করতে হয়েছে। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তের পর্বত প্রমাণ বাধা, অশোভন দলাদলি, রুচিহীন কুৎসা রটনা এসব কোনটির প্রতিই ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর। স্কুলের জন্যে প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জনেও দ্বিধা ছিল না তাঁর। রোকেয়া ছিলেন স্কুলের স্বার্থে সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করার পক্ষে। এক ব্যক্তিগত পত্রে তিনি লিখেছিলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"My only complaint against the former secies' was that they were pessimists and too cautious while my mind wanted to make a dashing jump: Had they not hold me back tightly perhaps the school could become a high school long ago and also could get a building by this time. I wanted to fight with the object. "বাঁচিলে হইব গাজী মরিলে শহীদ"–both the results are same to me. But the secretaries always wanted to be গাজী।[২৩]

স্পষ্টতই বোঝা যায়, স্কুলের ইতিহাসই ছিল তাঁর জীবনের ইতিহাস। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা আর আরাম-আয়েশ তা যত প্রয়োজনই হোক— স্কুলের স্বার্থেই বিসর্জন দিয়েছিলেন তিনি। স্কুলের জন্য শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রোকেয়া আরা, গয়া, মাদ্রাজ যেখানেই হোক ভাল শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যেত, সেখানেই ছুটে যেতেন।। রোকেয়ার ভাষায়,

"বাহিরে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়াছি, ভিতরে যে শুধু ছাত্রীকেই উপুক্ত শিক্ষাদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায়িত্রীদিগকেও ক্রমাগত নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হইয়াছে। স্কুলের জন্য "জগৎ ছানিয়া কি দিব আনিয়া"— এভাবে প্রাণপণ যত্ন করিয়া মাদ্রাজ, আরা, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি স্থান হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে"।[২৪]

স্বেচ্ছায় ভালবেসে পশ্চাদপদ স্ব-সমাজের স্ত্রী-শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন রোকেয়া ১৯০৯ সালে এবং ১৯৩২ সাল অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের নারীশিক্ষা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এ সম্পর্কে সরকার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিশ্চিত অবহেলা ও উদাসীনতা উপলব্ধি করেছেন তিনি। সমকালে ছেলেদের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য পাওয়া যেত অথচ প্রায়ই অর্থের অভাবে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের অচলাবস্থা সৃষ্টি হতো।

এই সমস্যা সম্পর্কে সমকালীন সংবাদপত্রের মন্তব্য–

'The school has had a life of twenty long years is because of liberality and self sacrificing devotion to its cause by Mrs. R.S Hossain the founder Superintendent there of. To conduct the school has been and is the sole concern of her life but it appears that on account of the colossal indifference of the community and the Government towards the institution the burden has become too heavy for her to bear.[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর স্কুল সম্পর্কে অন্যদের অনীহা ও উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন রোকেয়া। স্কুলের সভায় প্রদত্ত তাঁর এক ভাষণে এই ক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যায়—

"আমি সর্বদা আপনাদের এই স্কুলের বিষয় নিয়ে বিরক্ত করে থাকি। এমন কি অনেকে আমাকে এ জন্য একটা Nuisance বিশেষ মনে করেন। আমি যদি পৌত্তলিক হতুম, আমার কোন দেবতা থাকতেন তবে তিনিও নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'প্রার্থনার সময় ধনং দেহি, মানং দেহি, এসব কিছু না বলে এ মেয়েটা কেবল একঘেয়ে "স্কুলের জন্য গৃহং দেহি, স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি দেহি" বলে। দাও বেটিকে লাথি মেরে তাড়িয়ে।

আজ আমি আপনাদের নিকট খানিকটা সময় ভিক্ষা চাই যে, আপনারা দয়া করে ধৈর্য্যের সহিত আমার দুটি কথা শুনুন। আপনারা সবাই জানেন যে, এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটা না থাকলে আমি মরে যাবো না। এমনটি নিশ্চয় হবে না যে –

"ঘুঘু চরবে আমার বাড়ী
উননে উঠবে না হাঁড়ী
বৈদ্যতে পাবে না নাড়ী
অন্তিম দশায় খাবি খাব।"

এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই? তাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়; স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নয়; (সাখাওয়াত মেমোরিয়াল শব্দ দুটির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয় তবে সাইনবোর্ড থেকে শব্দ দুটি মুছে ফেলা যাক) চাই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য। অবশ্য মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ আমার কোন বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দুর্দশার আশঙ্কায় শংকিত হব কিংবা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন এই স্কুল সম্বন্ধে মাথা ব্যাথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, ভবিষ্যৎ আছে, তারা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়া এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন।"[২৬]

স্কুল বিষয়ে রোকেয়ার চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে রোকেয়ার ভাবশিষ্য শামসুননাহার মাহমুদ লিখেছেন, "তাঁহাকে মাঝে মাঝে বলিতে শুনিতাম, বেশি নয় আর দশটি বছর যদি বাঁচিতে পারি, তবে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ভিত্তি এমন মজবুত করিয়া দিয়া যাইতে পারিব যে, তাহার স্থায়িত্বের জন্য আর ভাবিবার কারণ থাকিবে না।"[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়া ছিলেন সমাজসেবী। সমাজের কল্যাণ কামনা তাঁর মন-প্রাণ অধিকার করেছিল। নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয় বরং সমাজের কল্যাণ-কামনায় তিনি স্কুলটি বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

রোকেয়া জীবনের অনেকখানিই অধিকার করেছিল রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম"। "আঞ্জুমানের কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখ, আমার কর্মজীবনের বহু কথা তাহারই মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে"— শামসুননাহার মাহমুদ রোকেয়ার কর্মবহুল জীবনের কথা জানতে চাওয়ায় রোকেয়ার উত্তর।[২৮] বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে রোকেয়ার অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়, শামসুননাহারের "রোকেয়া জীবনীতে"— "সভা সমিতি কাহাকে বলে তাহাও তাঁহাকে অনেক কষ্টে শিখাইতে হইতো। তিনি গল্পচ্ছলে বলিয়াছেন, "একবার অনেক সাধ্য সাধনার ফলে নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া একটি মুসলমান পরিবারের মহিলাকে আঞ্জুমানের মিটিং-এ আনা গেল। যথাযময়ে মিটিং-এর কাজ শেষ হইল। সমবেত মহিলারা গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় নবাগতা মহিলাটি রোকেয়ার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন; সভার নাম করিয়া বাড়ির বাহির করিলেন, কিন্তু সভা তো দেখিতে পাইলাম না; রোকেয়া অনেক কষ্টে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন যে, এখনই যে কাজ শেষ হইয়া গেল, তাহারই নাম সভা।"[২৯]

রোকেয়া বলিতেন, "যে কক্ষে সভা বসিত, প্রত্যেকটি অধিবেশনের পর তাহার দেওয়ালগুলি পানের পিকে এমন রঞ্জিত হইয়া যাইত যে, প্রত্যেক বারেই চুনকাম না করাইলে চলিত না। স্বয়ং সভানেত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সমাগত মহিলাদের মধ্যে কেহই অনুভব করিতেন না, যে-সময় সভার কাজ চলিতেছে অন্তত যে সময়টুকু নিজ নিজ আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা প্রয়োজন।"[৩০]

রোকেয়ার নেতৃত্বে অন্ধকার অবরোধে বন্দিনী নারীদের সচেতন করার পাশাপাশি কিছু রোকেয়া অনুরাগী সচেতন নারীদের সহায়তায় আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম দরিদ্র বালিকাদের জন্যে শিক্ষা এবং বিধবা ও আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য বস্তিতে বস্তিতে কুটির শিল্পের ব্যবস্থা করে। এমনকি অনেক অবিবাহিতা মেয়ের বিয়েরও ব্যবস্থা করে এ সমিতি। এছাড়া বস্তির অশিক্ষিত, দরিদ্র মহিলাদের শিশু পালন ও স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে সচেতন করে তোলাতেও ভূমিকা পালন করে এ সমিতি।

সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে মুসলমান নারীদের প্রথম সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম'কে একটি শক্তিশালী নারী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সফলভাবে এর কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমেও রোকেয়ার আত্মপ্রত্যয়ী, দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। রোকেয়া পরিচালিত আঞ্জুমানের এ সকল কার্যক্রম সমকালে সৃষ্টি করে আলোড়নের।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সংস্কারক রোকেয়া তাঁর এই সংগঠনের মাধ্যমে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের নারীদের উন্নয়নে কতখানি অবদান রেখেছেন তা জানা যায় শামসুননাহারের লেখায়, "কলিকাতার মুসলমান নারী সমাজের গত বিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টতই বুঝা যায়— এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলিম সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতবর্ষের আগামী শাসন-সংস্কারে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে এই সমিতি এককভাবে ও অন্যান্য নারী প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে যথেষ্ট কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছে।"[৩১]

"আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম" গঠনের উদ্দেশ্যে রোকেয়া যখন লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরেছিলেন তখন সমাজের চোখে তাঁকে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছিল। মুসলমান মেয়েরা ঘরের কোণ ছেড়ে সভা সমিতিতে যোগ দেবে একথা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। দিনের পরে দিন চেষ্টা করে ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি মেয়েদের হাতে ধরে ঘরের বের করেছেন। সভা-সমিতি গঠনের উপকারিতা বুঝিয়েছেন। রোকেয়ার জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় পাই শামসুননাহার মাহমুদের বর্ণনায়–

"রোকেয়া বলিতেন, যদি সমাজের কাজ করিতে চাও তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে, যেন নিন্দা গ্লানি, উপেক্ষা কিছুতে তাহাকে আঘাত করিতে না পারে, মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে যেন ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ সকলেই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।" এই একটি মাত্র কথার মধ্যে আমরা তাঁর কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস খুঁজে পাই। বাস্তবিকই রক্ষণশীল সমাজ তাঁর আত্মত্যাগের বিনিময়ে আঘাতের পর আঘাত দিয়েই চলেছিল তাঁকে। কিন্তু সমাজের মঙ্গল আকঙ্ক্ষাই তাঁকে একাকী পথ চলার সাহস যুগিয়েছে। ভারতবর্ষের আগামী শাসন-সংস্কারে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে এই সমিতি এককভাবে এবং অন্যান্য নারী প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করেছে। ১৯৩৫ সালের শেষভাগে বিহার-উড়িষ্যার ভূতপূর্ব গভর্ণর স্যার লরী হ্যামন্ডের নেতৃত্বে ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটি নারী অধিকার নিয়ে "আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম"-এর সাথে দরবার করেছিল।' [৩২]

১৯২১ সালে ভারতীয় মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গঠিত হয় "বঙ্গীয় নারী সমাজ।" কবি কমিনী রায় সংস্থার সভাপতি এবং মৃণালিনী সেন সহসভাপতি এবং কুমুদিনী বসু সাধারণ সম্পাদক নির্চাচিত হন। বঙ্গীয় নারী সমাজের এই ভোটাধিকার আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন রোকেয়া। বেগম সুলতানা মোয়াজ্জেদা এবং রোকেয়া সাখাওয়াত মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল অংশের নিন্দাবাদের শঙ্কা দূরে ঠেলে মুসলিম নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু ৫ সেপ্টেম্বর ১৯২১ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ৫৬-৩৭ ভোটে নারীর ভোটাধিকারের প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়ার জন্য এই আন্দোলনের ব্যর্থতা ছিল এক করুণ অভিজ্ঞতা। কারণ উদার মানসিকতার, মুক্তবুদ্ধির অধিকারী রোকেয়ার পড়াশোনা, পত্র-পত্রিকায় লেখা, সমাজসেবা সবকিছুর উৎসাহদাতা তাঁর বড়বোন করিমুন্নেছার পুত্র স্যার এ. কে. গজনভী— উদারবাদী মুসলিম আবহে যিনি লালিত, ভোট দিয়েছিলেন প্রস্তাবের বিপক্ষে। এ. কে গজনভী বিলেতে পড়াশুনা করলেও পাশ্চাত্যের উদার মনোভাব অন্ততঃ নারীর ভোটাধিকার তথা নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন যে আত্মস্থ করতে পারেননি সেটা রোকেয়ার জন্য ছিল দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। বিপক্ষে ভোটদাতা ছিলেন ডা: আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সোহরাওয়ার্দীর মা খুজিস্তা বানু ছিলেন মুসলিম নারী শিক্ষার একজন অগ্রপথিক অথচ পরিবারে তাঁর ছায়াপাত রক্ষণশীল আবহে তখনও ভাঙ্গন ধরাতে পারেনি। [৩৪]

১৯২৫ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নতুন করে অনুষ্ঠিত ভোটে ৫৪-৩৮ ভোটে নারীর ভোটাধিকার বিল পাস হয়। রোকেয়া ভোটের আগে বঙ্গীয় নারী সমাজের পক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার কাজে অংশ নেন। এ সময় বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানেও রোকেয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং এ আন্দোলনের ফলে রোকেয়ার সঙ্গে বাংলার অগ্রসর নারী সমাজের সম্পর্ক নিবিড় হয়। বঙ্গীয় নারী সমাজ-আয়োজিত "বেঙ্গল উওমেন্স এডুকেশনাল কনফারেন্সে" প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে। ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন : "The future of India is in its girls. The development of its educational system on proper line is therefore a question of permanent importance. Although India must learn many lessons from the West, to empose on it the western system without modifications to make it suitable to us is a huge mistake. India must retain her social inheritance of ideas and imotions, while at the same time by incorporating that which is useful from the west, a new educational practice and tradition may be inolved which will transcend both that of the East and the West". [৩৫]

বাংলার নারী আন্দোলনের এই সময়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে আয়োজিত নাগরিক শোকসভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন শ্রীমতী পি. কে. রায়— ভোটাধিকার আন্দোলন ও নারীশিক্ষা আন্দোলনে রোকেয়ার কর্মসাথী ছিলেন যিনি। রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে তিনি বলেন, "রোকেয়া শুধু নারী শিক্ষার অগ্রদূত ছিলেন না, নিছক মুসলিম নারীজাগরণের-ই কর্মী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সামগ্রিক নারীমুক্তি আন্দোলনের দিশারী। ভারতীয় সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র।" তিনি আরো বলেন, "She was a handsome, dignified little woman, full of enthusiasm and energy

Dhaka University Institutional Repository

with a very large heart which bled only for the improvement of the education of her own sex of the country. She was one of those Mahomedans to whom ritual and tenets were only means attain larger religious vision of life. I loved her because I found in her similiar aspirations and similiar ideas of life. To her Hindo and Mahomedans had no difference. I respected her for struggle of life and for the beautiful characteristics of Indian womenhood she preserved in herself to the end of her life." [৩৬]

বেগম রোকেয়া নিজ জীবনাভীজ্ঞতা দিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে-নারী জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ও ব্যর্থতা অনুভব করেছিলেন এবং নারীকে সমাজের প্রচলিত অবমানাকর নারীত্বের ধারণা থেকে মুক্ত করে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

নারীদের অধঃপতিত অবস্থার জন্য যে নারীরাও দায়ী–এ আত্মসমালোচনাতেও অকুণ্ঠিত রোকেয়া। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের কষাঘাতের আড়ালে দরদী রোকেয়া জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন অসাড়, অচেতন নারী হৃদয়কে। নারী বিদ্বেষী প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা করে রোকেয়া বলেন, "আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে মুনি ঋষি হইতে পারিতেন? যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে. ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাহার রাজত্ব ছিল না।" (সূত্র : আবুল কাসেম ফজলুল হক : বেগম রোকেয়া ও উত্তরকাল আশা আকাঙ্খার সমর্থনে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃ. ২১১)

কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতি রোকেয়া বুঝেছিলেন "সহস্রজনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কর্ম নহে।" তাইতো সহস্রজনকে জাগিয়ে তোলাই হয়েছিল তাঁর জীবন ব্রত।

আর এ লক্ষ্য পূরণের স্বার্থেই ইতিহাস প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমতি রোকেয়া বেছে নিয়েছিলেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে আপাত সমঝোতার পথ। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এ সমঝোতা রোকেয়ার গভীর জ্ঞান, সমাজ নিরীক্ষণে দক্ষতা ও যোগ্যতারই পরিচয় বহন করে। সময়ের চেয়ে অগ্রগামী রোকেয়া জানতেন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন নারীসমাজ তো দূর, কূপণ্ডুক মুসলিম সমাজ তাঁর চিন্তা-চেতনা, জীবনবোধ মূল্যায়নে অক্ষম। তাই ঘুমন্ত নারী সমাজকে জাগিয়ে তোলার স্বার্থেই তিনি পশ্চাদপদ সমাজের সব অন্যায় সহ্য করেছিলেন। তিনি জানতেন, ঘুমন্ত নারী সমাজ শিক্ষার আলো পেলে জেগে উঠবে। তাইতো মোল্লা

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীকে খুশী করতে লিখেছিলেন অনেকের মত স্ব-আদর্শবিরোধী প্রবন্ধ। বেছে নিয়েছিলেন অবরোধবন্দিনীর জীবন। সহস্রজীবনে আলো জ্বালাতে স্বেচ্ছায় হয়েছিলেন অন্ধকার বন্দিনী।

মৃত্যুর বছর খানেক আগে থেকেই তাঁর পেটের পীড়া ও কিডনীর গোলমাল দেখা দেয়। মৃত্যুর পূর্ব রাতেও রোকেয়া রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজ করেছিলেন। পরের দিন তাঁর নিয়মমতো শেষরাত ভোর ৪টায় উঠে ওজু করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। তাঁর চাচাত বোন মরিয়ম ও ছোটবোন হোমায়রা এ সময় তাঁর কাছে ছিলেন। মরিয়ম রশিদ পরে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'হঠাৎ তাঁর ডাক শুনতে পেলাম। আমার যেন কেমন লাগছে। শিগ্রী আয়। আমি ও ছোট আপা দৌড়ে গিয়ে দেখি তিনি শুয়ে হাঁসফাঁস করছেন, বলছেন "খোদা, খোদা"। কাছে যেতে গলার কাছে হাত দিয়ে দেখালেন "এইখানটায় বড় কষ্ট, ওঃ, ওঃ খোদা, খোদা" ৪.৩০ মিনিটের মধ্যে তিনি রোগাক্রান্ত ও শেষ হলেন।"[৩৭]

পরের দিন সকালে তাঁর টেবিলে পেপারওয়েটের নিচে পাওয়া যায়, নারী বিষয়ক একটি প্রবন্ধ 'নারীর অধিকার।' বেগম রোকেয়ার মৃত্যুসংবাদ প্রচার হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত পুরুষ মহিলায় তাঁর বাড়ী পূর্ণ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে মরিয়ম রশিদ লিখেছেন,

"এক ঘন্টার মধ্যে সমস্ত কলকাতা শহর যেন এই বাড়ীখানার উপর এসে পড়লো। সামনের সমস্ত কম্পাউন্ডখানা, রাস্তার ফুটপাত পর্যন্ত পুরুষে পূর্ণ হল, আর ভিতরটা মেয়ে মানুষে পূর্ণ হলো। এতবড় দালানখানায় লোক আটছিল না, অনেক মহিলা আপাজানের চারিদিকে বসে কোরান পড়া আরম্ভ করলেন।"[৩৮]

বেগম রোকেয়ার নামাজে জানাজায় মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নামাজে জানাযা কাইসার স্ট্রীটের বু-আলী মসজিদে জোহরের নামাজের পর অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর নামাজে জানাযায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন, জনাব এ. কে. ফজলুল হক, স্যার আবদুল করিম গজনভী, অনারেবল নবাব কেজি. এম. ফারুকী, অনারেবল খাজা নাজিমুদ্দিন, কে.বি. তোসাদ্দক আহমদ, কেবি তোফাজ্জল আহমেদ, জনাব আমিন আহমদ, ডঃ আর আহমদ, মৌলভী আবদুর রহমান, জনাব রেজাউর রহমান, নবাবজাদা কামরুদ্দীন হায়দার এবং মৌলভী মজিবুর রহমান প্রমুখ। জানাযার পর বেগম রোকেয়ার মরদেহ তাঁর পারিবারিক গোরস্থান কলকাতার অদূরে সোদপুরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই সমাহিত করা হয়।[৩৯]

মৃত্যুর পরদিন অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর কলকাতার বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে (The Musalman, Amrita Bazer Patrika, The Statesman, Advance) বেগম রোকেয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে অতি গুরুত্বের সাথে খবরটি পরিবেশন করা হয়। সেই সাথে বিভিন্ন লেখায় তাঁর কর্মময় জীবনের চিত্রও তুলে ধরা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার মৃত্যুতে 'The Musalman' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এতে দেশের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকগণ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবনী, নারীশিক্ষা আন্দোলনে তাঁর কৃতিত্ব ইত্যাদি তুলে ধরেন।

বাংলার তৎকালীন গভর্নর শিক্ষাব্রতী বেগম রোকেয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ও রোকেয়ার নিকটাত্মীয় আবদুল করিম গজনভীর নিকট এক শোকবার্তা প্রেরণ করেন।[৪০]

দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও সমিতি, কর্পোরেশন, স্কুল রোকেয়ার মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে শোকসভার আয়োজন করে। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রাঙ্গণে রোকেয়া স্মরণে এক শোক সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন লেডী আবদুর রহিম। মিসেস পি. কে. রায়, মিসেস আবদুল মমিন, মিসেস হাকিম সহ আরো অনেক খ্যাতনামা হিন্দু মুসলিম মহিলা উক্ত শোকসভায় যোগদান করে বেগম রোকেয়ার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উক্ত সভায় বেনিয়াপুকুর নামে পরিচিত রাস্তা অথবা অন্য কোন রাস্তা বেগম রোকেয়ার নামে করার প্রস্তাব কর্পোরেশনকে জানানোর এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। [৪১]

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর কলকাতা আলবার্ট হলে বেগম রোকেয়া স্মরণে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্যোক্তা ছিলেন "বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি", "বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সমিতি" ও "আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম" বা "নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি।" অতবড় হলে সেদিন তিল ধারনের স্থান ছিল না।

যারা জীবনে কোনদিন পর্দার বাইরে যাননি, এমন অনেক মহিলাকেও সেদিন বক্তৃতামঞ্চে উপবিষ্ট দেখা গেল। সভায় সভাপতিত্ব করেন গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস পি. কে. রায়। রোকেয়ার প্রতিভা, একনিষ্ঠ সমাজসেবা, মহান ত্যাগ, জ্ঞানানুরাগ, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইংরেজী বাংলা ও উর্দুতে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। চিরদিন যে সমাজ রোকেয়াকে আঘাতের পর আঘাত করেছে, সেই সমাজই আজ অন্তরের অন্তস্থল থেকে রোকেয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে। [৪২]

রোকেয়া শুধু কর্মী ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বাপ্নিক। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত তাঁর Sultana's Dream-এ নারী স্বাধীনতার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তাকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টাতেই তাঁর সারা জীবন অতিবাহিত হয়। তবে মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তাঁর কাজের সাফল্য দেখে যেতে পেরেছিলেন।

সুলতানার স্বপ্নে বর্ণিত উড়োজাহাজে বেড়ানোর স্বপ্ন রোকেয়ার জীবনে বাস্তবরূপ পেয়েছিল। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২ডিসেম্বর বঙ্গের প্রথম মুসলিম পাইলট মুরাদের সঙ্গে প্রথম অবরোধবন্দিনী নারী রোকেয়া আকাশে উড়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে শামসুন নাহার মাহমুদের বি.এ. পাশ উপলক্ষে তিনি এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। রোকেয়ার আহ্বানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কলকাতার বহু গণ্যমান্য মহিলা সেদিন এ সভায় সমবেত হয়েছিলেন।

সেদিন শামসুন নাহারকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত রোকেয়া বলেছিলেন, "আমার সেই বত্রিশ বৎসর পূর্বের মতিচূরে কল্পিত লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টারের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে— আমার এ আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায়? অনেকেই আরব্ধ কাজের সমাপ্তি নিজের জীবনে দেখিতে পান না। যে বাদশাহ্ কুতুবমিনার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমার মিনারের সাফল্য আজ আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম।" [৪৩]

রোকেয়ার সমসাময়িককালে ডাক্তার লুৎফর রহমান পতিত ও অবহেলিত নারী সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠন করেছিলেন 'নারীতীর্থ' (১৯২২) নামে একটি প্রতিষ্ঠান। পুরুষের প্ররোচনায় বিড়ম্বিত ও নিরাশ্রয় নারীদের আশ্রয়দান, বিভিন্ন উপার্জনকারী বিদ্যার প্রশিক্ষণ এবং যথোপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন লুৎফর রহমান। আদর্শ ও উদ্দেশ্যগত ঐক্যের কারণে রোকেয়া সানন্দে এইসব কর্মযজ্ঞের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। পরে নারীতীর্থের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভানেত্রীর দায়িত্বপূর্ণ পদেও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় অব্যাহত সহযোগিতা দান করেছিলেন।

"নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সমিতি"র আজীবন সদস্য ছিলেন তিনি। 'বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশনাল কনফারেন্স' এরও বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। [৪৪]

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে নারীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন রোকেয়া। আর তাই নারী সমাজের শাসনতান্ত্রিক অধিকার যেমন বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, পিতা ও অভিভাবকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, জীবনোপায় অবলম্বনের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে দাবী উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে অব্যাহত সহযোগিতা দান করেছেন তিনি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রোকেয়া ব্যয় করেছেন নারী কল্যাণাকাঙ্ক্ষায়।

**তথ্যসূত্র :**


১। আবদুল মান্নান সৈয়দ : বেগম রোকেয়া, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, পৃ. ১৭।

২। তাহমিনা আলম : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজ কর্ম, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৪।

৩। লায়লা জামান : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, প্রথম প্রকাশ বাংলা একাডেমি, পৃ. ১৮।

৪। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯ বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

৫। লায়লা জামান : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, প্রথম প্রকাশ বাংলা একাডেমি, পৃ, ২০।

৬। ঐ পৃ. ২০।

৭। ঐ পৃ. ২০।

৭। ঐ পৃ. ২০।

৮। ঐ পৃ. ২০।

৯। মোশফেকা মাহমুদ পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫ পৃ.–১৯।

১০। মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন : সওগাত : বৈশাখ, ১৩৮৫, পৃ. ৯৭।

১১। লায়লা জামান : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, প্রথম প্রকাশ বাংলা একাডেমি, পৃ, ২১।

১২। মোতাহার হোসেন সুফী – বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০১, প্রকাশক : আহমেদ মাহফুজুল হক, সুবর্ণ, পৃ. ৪৮।

১৩। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯ বাংলা একাডেমী, পৃ. ৬৫।

১৪। ঐ পৃ. ৪১।

১৫। মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন : সওগাত : বৈশাখ, ১৩৮৫, পৃ. ৪।

১৬। শামসুন নাহার মাহমুদ : রোকেয়া জীবনী, প্রকাশ নভেম্বর ২০০০, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪২।

১৭। ঐ পৃ. ৪৪।

১৮। ঐ পৃ. ৪০।

১৯। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯ বাংলা একাডেমী, পৃ. ১১৬।

২০। ঐ পৃ. ১১৮।

২১। ঐ পৃ. ১১৯।

২২। মোশফেকা মাহমুদ পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, প্রথম চিঠি- পৃ. –১৪, দ্বিতীয় চিঠি পৃ.–২০।

২৩। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯ বাংলা একাডেমী, পৃ. ১২১।

২৪। ঐ পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৫। লায়লা জামান : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, প্রথম প্রকাশ বাংলা একাডেমি, পৃ, ২১।

২৬। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন–রোকেয়া রচনাবলী, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল, ১৪ এপ্রিল, ২০০৬, পৃ.-৪০৫।

২৭। শামসুন নাহার মাহমুদ : রোকেয়া জীবনী, প্রকাশ নভেম্বর ২০০০, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৬৫।

২৮। ঐ পৃ. ৫০।

২৯। ঐ পৃ. ৫১।

৩০। ঐ পৃ. ৫১।

৩১। ঐ পৃ. ৫২।

৩২। ঐ পৃ. ৫১।

৩৩। মফিদুল হক – নারীমুক্তির পথিকৃৎ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ২৪।

৩৪। ঐ পৃ. ২৫।

৩৫। ঐ পৃ. ৩১।

৩৬। ঐ পৃ. ৩০।

৩৭। মোতাহার হোসেন সুফী – বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০১, প্রকাশক : আহমেদ মাহফুজুল হক, সুবর্ণ, পৃ. ২৮।

৩৮। ঐ পৃ. ২৮।

৩৯। তাহমিনা আলম : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজ কর্ম, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২২।

৪০। ঐ পৃ. ২৩।

৪১। ঐ পৃ. ২৩।

৪২। মোতাহার হোসেন সুফী – বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০১, প্রকাশক : আহমেদ মাহফুজুল হক, সুবর্ণ, পৃ. ২৮।

৪৩। শামসুন নাহার মাহমুদ : রোকেয়া জীবনী, প্রকাশ নভেম্বর ২০০০, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৬৪।

৪৪। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯ বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

# সাহিত্য সাধনা

পদ্মরাগ উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকার দৃঢ়, প্রত্যয়ী উচ্চারণ 'আমি আজীবন তারিণী ভবনে থাকিয়া নারী জাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব"– যেন রোকেয়ারি কণ্ঠস্বর। রোকেয়া সমকালীন নারী সমাজ ছিল অচলায়তন অবরোধের কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দিনী প্রগতি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী মোল্লাতন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট সকল সামাজিক সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের পক্ষে রোকেয়াই প্রথম হাতে কলম তুলে নেন এই অমানবিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন "নারীও মানুষ"। দাবী করেন সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার। নারীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে নয়, মাতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করে নয়, তিনি দাবী করেছেন নারীর মানবিক অধিকার– মানুষ হিসাবে বাঁচার অধিকার। তিনি বলেন, "নারী-পুরুষ একই সমাজ দেহের দুইটি অঙ্গ.....।"

তিনি নারী সমাজের উন্নতি চেয়েছেন – চেয়েছেন সমাজের কল্যাণ। রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমনি এক সময়ে যখন মুসলমান শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যেও অনুভূত হচ্ছে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। বলা যেতে পারে হাজারো বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রোকেযা সময়ের আনুকূল্যও পেয়েছেন। বলা যায় রোকেয়া সময়েরি সন্তান।

রোকেয়ার কর্মপ্রয়াস বাধাগ্রস্ত হলেও সফল হয়েছে এ জন্যই। রোকেয়া সাহিত্য সমালোচিত ও আলোচিত হলেও সফলতা পেয়েছে এ কারণে। লেখক সাইফুল ইসলামের মূল্যায়ন–

"ঘটনাক্রমে রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশে, যে ভূখণ্ড একজন মহান ত্রাণকর্তার ভূমিকা দাবি করে আসছিল: এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যে সময়ে পুরুষশাসিত সমাজের কবল থেকে শেকলবেষ্টিত নারীরা মুক্তি/পরিত্রাণ কামনা করছিল— যদিও তারা জানতো না মুক্তি কী, আর কিভাবে তা অর্জন করা সম্ভব? অবরুদ্ধ একটি পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে রোকেয়া উদ্ভাবন করলেন নারী মুক্তির বৈজ্ঞানিক সংহত স্বভাবগ্রাহ্য পদ্ধতি। শুধু বাঙালি নয়— সমগ্র ভারতবর্ষের নারীরা এই প্রথম যথার্থ মুক্তির আলো দেখতে পায়, যুগ যুগ ধরে লালিত অন্ধকারের মাঝে, একজন নারীর নেতৃত্বে"।[১]

রোকেয়া নারীমুক্তির প্রশ্নে তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে লেখনি চালিয়েছেন ঃ প্রথম– নারীশিক্ষা ও নারী অধিকার বিষয়ে সমাজে সচেতনতাবোধ তৈরি, দ্বিতীয়ত নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাবলম্বন এবং তৃতীয়ত: নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। এই তিনটি লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

পূরণ হলে তবেই "নারীমুক্তি" সম্ভব বলে রোকেয়ার বিশ্বাস। যুগের তুলনায় প্রাগসর রোকেয়া নারীকে অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যে কোন কাজ বেছে নেয়ার আহ্বান জানান, "আবশ্যক হইলে লেডী কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জজ সবই হইব।"– যা ছিল সেই সময়ের তুলনায় বিপ্লবী উচ্চারণ। যে উচ্চারণ রোকেয়াকে করে বিতর্কিত, করে মোল্লাতন্ত্রের কঠোর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। নারী মুক্তি সম্পর্কিত রোকেয়ার চিন্তা-চেতনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বলেন–

"তিনি নারীমুক্তির কামনা করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই লেখনীর মাধ্যমে সমাজকে নারীর অধঃপতিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। সমাজ ও জাতির কল্যাণের নিমিত্ত নারীর শিক্ষিত ও সচেতন হওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, নারীর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হওয়া যে আবশ্যক, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির যে অপরিহার্যতা রয়েছে এবং নারীর মানসিক দাসত্বের অবসান যে একান্তভাবে কাম্য– জোরালো যুক্তি দিয়ে তিনি তাঁর এ বক্তব্য সমাজের নিকট উপস্থাপন করেন। সমাজে তার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। রোকেয়া লিখেছেন প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস-এর প্রতিটি তিনি ব্যবহার করেছেন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্ররূপে"।[২]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ মনীষী হিন্দু নারী সামজের অবমাননায় ও নিপীড়নে উদ্বেলিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সামাজিক ও আইনগত মর্যাদার উন্নতিকল্পে ধর্মীয় অনুশাসনের বিকৃত ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে বাঙালি হিন্দু নারী সমাজের সামাজিক ও আইনগত অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমান সমাজে রাজা রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় কোনো মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেননি। তাই দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে রেনেসাঁসের আন্দোলনে হিন্দু সমাজের মেয়েদের অধঃপতিত অবস্থার উন্নতি হয়, সেই রেনেসাসেঁর দীপ্তি মুসলমান জেনানার পর্দা ঠেলে আর অগ্রসর হয় না। ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় জীবন ধর্মের আহ্বানে হিন্দু সংস্কারবাদীরা সমাজের উপেক্ষিত নারী সমাজের নিরক্ষরতা অবসানের জন্য কোমর বেঁধে লাগলেন, কিন্তু সে সৌভাগ্য ঘটল না নির্যাতিত মুসলিম নারী সমাজের। যার ফলে তারা যে অন্ধকার অবরোধে ছিল সেই অন্ধকারেই বন্দিনী রয়ে গেল। একদিকে অবরোধ প্রথা, অন্যদিকে অশিক্ষা— ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও এই ছিলো বাঙালি মুসলমান নারীর নিয়তি। রোকেয়ার শৈশবও কেটেছে এই পরিবেশে। এই পরিবেশে বড় হয়ে রোকেয়া উত্তরকালে, তাঁর সারা জীবন, অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে— নারীমুক্তির স্বপক্ষে লেখনী চালনা করেছেন অবিরাম।

Dhaka University Institutional Repository

লেখিকা হিসেবে বিয়ের পরেই রোকেয়ার প্রথম আত্মপ্রকাশ। যতোদূর জানা যায়, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত 'নবপ্রভা' পত্রিকায় প্রকাশিত (ফাল্গুন-১৩০৮) 'পিপাসা' রোকেয়ার প্রথম মুদ্রিত রচনা। ভাগলপুরে বসে রোকেয়া লেখেন তাঁর একমাত্র ইংরেজী গ্রন্থ 'Sultana's Dream' ১৯০৫ সালে। গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে।

১৯০৫ সালে 'মতিচূর' প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। এরপরে রোকেয়ার লেখক জীবনে দীর্ঘ বিরতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর দু'এক বছর পূর্ব থেকেই রোকেয়ার রচনাধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। স্বামীর দীর্ঘ অসুস্থতা হতে পারে এর কারণ। রোকেয়া দুবার দুটি কন্যা সন্তানের জননী হয়েছিলেন; কিন্তু দুটি সন্তানই মারা যায় কয়েক মাস বয়সে। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৯০৯ সালের ৩ মে সাখাওয়াত হোসেন-এর মৃত্যু হয়। এরপর ১৯১৮ সালে রোকেয়া আবার লিখতে শুরু করেন।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের রচনা পরিমাণে বিপুল না হলেও বৈচিত্র্যে ভরপুর, যে নারী শিক্ষা ও নারীজাগরণের প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সকর্মক স্বাক্ষর একদিকে তাঁর স্কুল, অন্যদিকে তার চিন্তাশীলতা— যার প্রকাশ তাঁর রচনাবলীতে বিধৃত।

রোকেয়া জীবনে একটা বিশিষ্ট দিক দখল করে আছে তাঁর সাহিত্য সাধনা। সাহিত্যিক রোকেয়ার জন্ম কর্মী রোকেয়ার সহায়ক সত্তা হিসেবেই। সাহিত্যের মাধ্যমেই রোকেয়া তাঁর আদর্শ সমাজের রূপরেখা তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। ব্যাখ্যা করেছেন নারী মুক্তির যৌক্তিকতা। অসাড়, অচলায়তন সমাজ ভাঙার প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রোকেয়া সাহিত্য। তাঁর সমকালের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহমান কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামী, নারী সমাজের অবমাননাকর অবস্থা-সবেরি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ রোকেয়া সাহিত্য। চিন্তা-চেতনায় নতুন ভাবধারার অধিকারী রোকেয়ার সাহিত্য সৃষ্টিও একেবারে নতুন ও নিজস্ব। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের তুলনায় তাঁর রচিত সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

সমাজ সংস্কারক রোকেয়া সমাজসংস্কারের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কলম ধরেছিলেন। ভাবাবেগ প্লাবিত সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য নয়–তাঁর লক্ষ্য তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে জর্জরিত করে, সমালোচনার চাবুক চালিয়ে অসচেতন, মোহগ্রস্ত সমাজকে জাগানো। তাই তাঁর সাহিত্যের ভাষা হলো সহজ, সরল কিন্তু তীক্ষ্ণ, যুক্তিপূর্ণ।

রোকেয়া সাহিত্যের আরেক বৈশিষ্ট্য ব্যাঙ্গ ও হাস্যরস। ব্যাঙ্গ ও হাস্যরসের মাধ্যমে রোকেয়া সমাজের প্রচলিত ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। ফলে সাহিত্যাঙ্গনেও সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য রোকেয়া সমালোচকের। রোকেয়া সৃষ্ট প্রবন্ধকে ঘিরে সংবাদপত্রে বয়ে গ্যাছে বাদ-প্রতিবাদের ঝড়। কিন্তু নিঃস্বার্থ ও সমাজের কল্যাণকামী, সময়ের দাবীকে বুঝতে সক্ষম রোকেয়া দৃঢ়তার সাথে নিজ লক্ষ্য পথে এগিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল মান্নান সৈয়দের মূল্যায়ন–

Dhaka University Institutional Repository

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জন্ম নিলেও রোকেয়ার লেখিকা হিসেবে আবির্ভাব বিংশ শতাব্দীতে এবং চৈতন্যে ও মানসে তিনি বিংশ শতাব্দীরই লেখিকা ছিলেন। তাঁর সাহিত্যকাজ পুরো তিন দশক ব্যাপী (১৯০১-৩২)। সেদিক থেকে আধুনিক সাহিত্যের একশো বছর ছিলো তাঁর পেছনে অর্থাৎ পুরো উনিশ শতাব্দী। লেখিকা হিসেবে রবীন্দ্রযুগেই তাঁর আর্বিভাব ও তিরোভাব (রবীন্দ্র-কাল: ১৮৬১-১৯৪১)। কিন্তু রোকেয়ার সন্ধান ও ক্ষেত্র অন্যত্র ছিলো বলে তিনি কোনভাবেই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন হননি। রাবীন্দ্রিক কল্পনা, ভাবাবেগ, স্বপ্নাচ্ছন্নতা, আধ্যাত্মিকতা, শিল্পচারিতার স্থলে রোকেয়া মোকাবিলা করেছিলেন চাঁচাছোলা বাস্তবের— যুক্তিশীলতার, সামাজিক সমস্যার, নারী-জাগরণের। সেদিক থেকে রোকেয়ার সাযুজ্য বরং উনিশ শতাব্দীর সংস্কারকামী এবং জাগরণকামী পুরুষদের সঙ্গে— বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) সাথে। বিদ্যাসাগরের মতো রোকেয়ারও লক্ষ্য ছিলো নারী সমাজের অধিকার ও আত্মসংবিৎ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে দেশ ও জাতি গঠন; আর বিদ্যাসাগরের মতো তাঁরও সমাজসেবা ও সংস্কারমূলক সমস্ত কাজে মানবতাবাদই ছিলো আদর্শ। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও ছিলেন সংস্কারবাদী যা প্রায় বিপ্লবের সগোত্র। আর রোকেয়ার এই সামাজিক মানবিক দ্রোহের পিছনে ছিলো তখনকার বাঙালি মুসলমান সমাজের বিশেষ অবস্থা ও অবস্থান"।[৩]

রোকেয়ার আগে বাঙালি-মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রধান ও পরিচিত ছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮), মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬) প্রমুখ। লক্ষণীয় যে, এঁরা প্রায় সবাই সৃষ্টিশীল রচনায় নিরত না থেকে (মীর মোশাররফ হোসেন বাদে) সামাজিক, সাহিত্যিক ভাবনা— প্রধান রচনাতেই প্রধানতঃ নিবিষ্ট।[৪]

অষ্টাদশ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণে কোন মুসলমান মহিলার সাহিত্যে পদচারণার সংবাদ পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের জনৈক রহিমুন্নেছার কাব্যচর্চার তথ্য উদ্ধার করেছেন ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক। ডক্টর হকের মতে, রহিমুন্নেছার আবির্ভাব আনুমানিক ১৭৬০-১৮০০ এর মধ্যে। সম্ভবতঃ রহিমুন্নেছাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মুসলমান কবি।[৫]

মধ্য যুগের আরেক কবি চন্দ্রাবতী–নারীবাদী মনোভাবাপন্ন কবি চন্দ্রাবতী।

চন্দ্রাবতী– কিশোরগঞ্জ জেলার মাইজকাপন ইউনিয়নের পাতুয়ারী গ্রামে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাস। মা সুলোচনা দেবী। কবি

Dhaka University Institutional Repository

চন্দ্রাবতী শৈশব থেকেই কবিতা রচনা করতেন। বিভিন্ন মেয়েলী ব্রতের ছড়া, প্রাচীন আচার-পদ্ধতি অবলম্বনে বিভিন্ন কবিতা, সত্য ঘটনা অবলম্বনে 'দস্যু কেনারামের পালা', 'মলুয়া পালা'সহ গ্রামের সাধারণ মানুষকে নিয়েও অসংখ্য গান রচনা করেছেন চন্দ্রাবতী।

লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে সর্বপ্রথম চন্দ্রাবতীকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন কেদার নাথ মজুমদারের 'সৌরভ' পত্রিকার মধ্য দিয়ে।

চন্দ্রবতীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'রামায়ণ'। প্রচলিত রামায়নে সাতটি কান্ডে বিভিন্নভাবে রামের প্রশস্তি বা বন্দনাগীত গাওয়া হয়েছে। কিন্তু চন্দ্রাবতীর রামায়ণের বৈশিষ্ট্যই হলো– "মধ্যযুগের সমাজে বীর মহিমায় জর্জরিত রাম সাহিত্যকে পুরো বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে একেবারে আলাদা একটা নারী-দৃষ্টিকোণ থেকে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ-পুনর্লিখন এবং এই মহাকাব্যের বীর পুরুষ রামের মহিমাকে প্রচুর রকম ধ্বসিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সীতাকে রামের স্থানে প্রতিস্থাপন "(সুত্র-সুস্মিতা চক্রবতী : চন্দ্রাবতীর রামায়ন: 'নারীর ইতিহাস', নারীর স্বর, চন্দ্রাবতী, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ সম্পাদক, সুস্মিতা চক্রবর্তী) ষোড়শ শতকের আরেক তেলেগু কবি মোল্লা শুদ্র নারী হয়েও প্রচলিত রামায়ণের কাহিনীকে তার লেখার উপজীব্য করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রবতীর 'রামায়নে' স্বতন্ত্র মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে রয়েছে তিনটি কাণ্ড। তাঁর রামায়নে নারীবাদী চেতনাটিই প্রখর হয়ে ধরা পড়েছে। আর পরবর্তীতে তা নারীদেরই একান্ত সম্পদ হিসেবে চর্চিত হয়ে টিকে আছে।

শোষিত বঞ্চিত নারীরা চিরকালই তাদের মনোকষ্টের, তাদের উপায়হীনতার বেদনাকে রূপ দিয়েছে মেয়েলী ব্রতে, বারোমাসী ছড়ায়, গানে। কোনকালেই বাংলার নারীরা নিরবে মেনে নেয়নি তাদের অধিকারহীনতাকে, বঞ্চনাকে। তবে বিশ শতাব্দীর শুরুতে নারীর পশ্চাদপদ অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরে প্রথম এর দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনিই বলেছেন এমন সব কথা, যা এযাবৎকালে কেউ বলার সাহস করে নি। প্রশ্ন তুলেছেন এমন সব বিষয় নিয়ে, যা প্রচলিত মূল্যবোধকে সরাসরি আঘাত করে। রোকেয়াই প্রথম বঙ্গদেশে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে নারীমুক্তির দাবী করেছিলেন। যদিও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে হিন্দু সমাজই অগ্রণী তবুও বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গ ললনাদের মধ্যে সব থেকে রেডিক্যাল বৈপ্লবিক, প্রতিবাদে দৃঢ় কণ্ঠস্বর একজন মুসলমান মহিলার "তিনি বেগম রোকেয়া"।

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের পূর্বে লেখনী ধারণ করেছিলেন, খুলনার আজিজুন্নেছা খাতুন। তিনি ইংরেজ কবি পার্নেলের 'হারমিট' কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন 'উদাসীন' নামে। সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী মুন্সী মেহেরুল্লাহ কন্যা খায়রুন্নেছা (১৮৮০-১৯১২) তদানীন্তন মুসলিম নারীর হীনাবস্থা ও দুর্দশা বিষয়ে 'সতীর পতিভক্তি' নামক গ্রন্থে আলোচনা করেন।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম গদ্য লেখিকা তাহেরুন নেসার আবির্ভাব ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে। তাঁর স্বল্পসংখ্যক রচনায় উত্তম গদ্যরীতির স্বাক্ষর আছে। লতিফুন্নেছা ও আফজালুন্নেছার রচনাও এ সময়ের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। রোকেয়ার বড়বোন করিমুন্নেছার কাব্যচর্চার ইতিহাসও রোকেয়ার পূর্ববর্তী কালের। কুমিল্লা জেলার লাকসাম পশ্চিম গাঁওয়ের জমিদার নওয়াব ফয়জুন্নিসা (১৮৫২-১৯০৩)-র মিশ্র আঙ্গিকের রচনা 'রূপজালাল' (১৮৭৬) প্রকাশিত হয়েছে রোকেয়ার জন্মেরও আগে।[৭]

সাজেদা খাতুন, মিসেস এম. রহমান, কাসেমা খাতুন, (মিসেস আর.বি. খান), রেজিয়া খাতুন ও নূরুন্নেছা বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯২-১৯৭৫) প্রমুখ সাহিত্যিক রোকেয়ার সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। বেগম সারা তায়ফুর "স্বর্গের জ্যোতি" (১৯১৬) লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সৈয়দা মোতহেরা বানু, এম ফাতেমা খানম, প্রমুখ লেখিকাদের অবদানও উল্লেখযোগ্য। সিলেটের সাহিফা বানু (১৮৫০-১৯২৬) বিবিধ বিষয়ে একাধিক কাব্য রচনা করেন।[৮]

সমকালীন লেখিকাদের তুলনায় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যচর্চা এক বিরাট ব্যতিক্রম। রোকেয়া গদ্য ও পদ্য উভয় ধারার সাহিত্যচর্চাতেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমকালের সামাজিক-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা ও নারীর আত্মজাগৃতিকে অবলম্বন করে রোকেয়া সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। সে যুগের উপাধিধারিণী লেখিকাদের তালিকাভুক্ত হতে রোকেয়ার ঘোরতর আপত্তি ছিল। "নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ" তাঁকে 'বিদ্যাবিনোদিনী' ও 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধি দিতে চাইলে রোকেয়া বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৯]

রোকেয়া রচিত গ্রন্থাবলী : ১। মতিচূর (১৯০৪-১৯২২) (১ম ও ২য় খণ্ড), ২। Sultana's Dream-১৯০৮ (সুলতানার স্বপ্ন), ৩। পদ্মরাগ (১৯২৪) ৪। অবরোধবাসিনী (১৯৩১)।[১০]

মতিচূর-১ম খণ্ড (১৯০৫) সালে প্রকাশিত হয় বলে উল্লেখ করেছেন গবেষক তাহমিনা আলম— তাঁর এম.ফিল থিসিস- 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম'-তে।[১১]

জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত 'নবপ্রভা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পিপাসা' প্রবন্ধটিই এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে রোকেয়ার প্রথম প্রকাশিত (ফাল্গুন-১৩০৮) রচনা। এটি ১৯০১ খিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১২] 'পিপাসা' প্রবন্ধে রোকেয়ার ব্যক্তিজীবনের শূন্যতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়। দুইকন্যা ও স্বামীর মৃত্যুতে রোকেয়া যে কষ্ট পান, যে শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হন, তারি বহিঃপ্রকাশ 'পিপাসা'। এ প্রসঙ্গে গবেষক শামসুল আলম বলেন— 'রোকেয়া তাঁর রচনা 'পিপাসা : মহরম'-এ মর্মান্তিক কারবালার শোকাবহ ঘটনার উল্লেখা মাত্র করে এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। 'পিপাসায় একটি সর্বব্যাপী হাহাকার, বেদনাবোধের একটি বিশ্বজনীন রূপ আরোপ করে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতার সীমাবদ্ধতা থেকে সরিয়ে এনে স্থাপন করেছেন মনুষ্যত্বের সীমাহীন প্রসারতায়। অন্যান্য সামাজিক সমস্যামূলক রচনায় রোকেয়া যেমন বস্তুনিষ্ঠ, সত্যসন্ধানী এবং নির্মোহ এই বিশেষ রচনাটিতে তিনি তা নন, এখানে তিনি ভাববিহ্বল এবং আবেগকম্পিত'।[১৩] রোকেয়ার ব্যক্তিহৃদয়ের হাহাকার (শিশু কন্যার মৃত্যুজনিত) শোকোচ্ছ্বাস এ প্রবন্ধের উপজীব্য বলে মনে হয়। এরপরে 'মহিলা' নবনূর, নবপ্রভা, অন্তপুর প্রভৃতি পত্রিকায় রোকেয়ার অনেকগুলি কবিতা, প্রবন্ধ, ও ভ্রমণ কাহিনী বেরিয়েছিল।[১৪]

রোকেয়ার সর্বাধিক আলোচিত ও বিতর্কিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে "অলঙ্কার না "Badge of Slavery" পরে যথাক্রমে যা 'আমাদের অবনতি' (নবনূর) ও 'স্ত্রী জাতির অবনতি' (মতিচূর প্রথম খণ্ড) বলে প্রকাশিত। মহিলায় প্রথম প্রকাশকালে 'অলঙ্কার' না 'Badge of Slavery' প্রবন্ধটির আকার বেশ বড় ছিল। 'মহিলা'র তিনটি সংখ্যা ১৩১০ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যাত্রয়ে প্রবন্ধটির প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। অন্যদিকে 'নবনূরে' প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয় মাত্র একটি সংখ্যায় ভাদ্র, ১৩১১ (২য় বর্ষ: ৫ম সংখ্যা)। 'মতিচূর'-এ (১ম খণ্ড) সংকলিত প্রবন্ধটি হচ্ছে মূল প্রবন্ধের তৃতীয় রূপান্তরিত ও সংশোধিত রূপ।[১৫] রোকেয়ার রচনার সজীবতা, প্রাণবন্ততা, চিন্তা, যুক্তিশীলতা ও অন্তর্গত দ্রোহিতার কারণে তাঁর অনেক লেখা নিয়েই বাদ-প্রতিবাদ চলে। "আমাদের অবনতি" প্রবন্ধটি নিয়েও পক্ষে-বিপক্ষে লেখা হয়। উক্ত প্রবন্ধে রোকেয়া নারী সমাজের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে তীব্র ভাষায় তাদের এই অবস্থা থেকে উত্তরণের আহ্বান জানান।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচূর' প্রথম খণ্ড গ্রন্থটিতে মোট সাতটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। 'মতিচূরে'র প্রবন্ধসমূহ পূর্বে 'নবপ্রভা', মহিলা, 'নবনূর' মাসিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৬] সমকালীন সমাজের নারীদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে এ গ্রন্থে তিনি পুরুষের সমান অধিকার দাবী করেন। তিনি নারীদের পুরুষের সমান যোগ্যতাসম্পন্ন বলে ঘোষণা করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নারীমুক্তি প্রশ্নে এ গ্রন্থের প্রকাশনা নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

'মতিচূর' প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রবন্ধ 'পিপাসা'। এ প্রবন্ধে রোকেয়ার ব্যক্তি হৃদয়ের মর্মবেদনা প্রকাশ লাভ করেছে। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'স্ত্রী জাতির অবনতি' রোকেয়ার অন্যতম আলোচিত-সমালোচিত প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে রোকেয়া উদঘাটন করেছেন সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের নারী সমাজের বিশেষ করে মুসলিম নারী সমাজের দুর্দশার চিত্র। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে নারী অধস্তনতার প্রতি রোকেয়ার প্রশ্ন—'পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোনদিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কি?' এই প্রশ্নে রোকেয়ার উত্তর অন্বেষণে উঠে এসেছে নারীর অধস্তনতার সঙ্গে ব্যক্তিক, মতাদর্শিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা সম্পর্ক। যেখানে একপক্ষ স্বামী বা প্রভু, আরেকপক্ষ অবশ্যই দাস। রোকেয়ার যৌক্তিক বিশ্লেষণ 'ত্রাণকর্তাকে দাতা বলিলে যেমন—গ্রহণকর্তাকে

Dhaka University Institutional Repository

"গ্রহিতা" বলিতেই হয়, সেইরূপ একজনকে "স্বামী প্রভু ঈশ্বর" বলিলে অপরকে দাসী না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন।'[১৭] ('স্ত্রীজাতির অবনতি: মতিচূর প্রথম খণ্ড)।

পাশাপাশি রোকেয়ার সুস্পষ্ট মত— পারিবারিক জীবনে সেবা (Service) বলে একচেটিয়া কোন কিছু নেই বরং তা পারস্পরিক। উপার্জন থেকে শুরু করে পারিবারিক সম্পর্ক নির্বাহ— সন্তান লালন সব কিছুর মধ্য দিয়ে পরিবার প্রথার যে ক্রিয়াশীলতা তার জন্যে পুরুষকে দাস অভিধা বরণ করতে হয় না— যা করতে হয় নারীকে, কেন? এর উত্তরে রোকেয়া দায়ী করেছেন ভারতীয় নারীর মানসিক দাসত্বকে। সাথে সাথে নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাবকেও।

নারীর অতি প্রিয় অলংকারের ইতিহাস ও সেগুলোর ব্যবহারের বিশ্লেষণ করেছেন রোকেয়া। অলংকারকে তিনি দাসত্বের নির্দশন বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন— 'আমাদের অতিপ্রিয় অলংকারগুলি দাসত্বের নির্দশন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্য বর্দ্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলংকার দাসত্বের নির্দশন (Originally bages of slavery) ছিল। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ প্রায় লৌহ নির্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ 'মল' পরি–' (স্ত্রী জাতির অবনতি : মতিচূর, প্রথম খণ্ড)।

তৎকালীন ভারতবর্ষের নারীর সামাজিক অবস্থান রোকেয়াকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তিনি বিহারের এক ধনী মুসলিম পরিবারের (আট সের স্বর্ণালঙ্কার পরিহিত) সদ্য বিবাহিত বধূর প্রতিকৃতি অঙ্কনের মাধ্যমে নারীর পুত্তুলিকাবৎ অসার জীবনচিত্র সমাজের সামনে তুলে ধরে শ্লেষের সাথে বলেছেন, "ইহাকে কোন প্রসিদ্ধ জাদুঘরে (museum) বসাইয়া রাখিলে রমণী জাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত।" তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন যে, 'এই প্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র'।[১৮] (স্ত্রীজাতির অবনতি : মতিচূর, প্রথম খণ্ড)।

অলঙ্কার পরানোর মধ্যে দিয়ে নারীর অস্তিত্বকে পর্যন্ত হেয় ও অস্বীকার করা হয় এভাবে ঃ "গোস্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া নাকে দড়ি পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে নোলক পরায়, ঐ নোলক হইতেছে স্বামীর অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন।" [১৯] (স্ত্রীজাতির অবনতি : মতিচূর, প্রথম খণ্ড)।

রোকেয়ার স্থির সিদ্ধান্ত : নারী যেন সার্বক্ষণিক দাসী সেজে থাকতে সক্ষম হয় চেতনে কিংবা অবচেতনে; সে বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করতে পুরুষতন্ত্র বাহ্যিকভাবে পরিয়েছে অলংকার আর মানসিকভাবে চর্চা করিয়েছে দাসত্বের— সমাজ, ধর্ম, দৌর্বল্য ইত্যাদির দোহাই দিয়ে।

রোকেয়া নারীমুক্তির পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন নারীর মানসিক দাসত্বকে– 'আমাদের একটা রোগ আছে দাসত্ব।'[২০] (অর্দ্ধাঙ্গ মতিচূর, প্রথম খণ্ড) রোকেয়ার মতে, "স্ত্রী জাতির অন্তকরণে পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি এই, (কোন বিষয়টি শিক্ষার), অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ নারীকে শিক্ষা দেয়—নির্বোধ স্ত্রী লোকের কর্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে।" [২১] (স্ত্রীজাতির অবনতি : মতিচূর, প্রথম খণ্ড)।

নারীর স্বামীকে বলা হয় 'স্বামী' বা 'প্রভু'। এবং নারী এই প্রভুর গৃহপালিত পশু, মূল্যবান আসবাবপত্র, গৃহসজ্জা অথবা অন্য পাঁচটা সম্পত্তিরই অন্যতম বলে বিবেচিত। প্রচলিত মূল্যবোধে বিশ্বাসী নারীও নিজেকে পরের অধীন বলে বিবেচনা করে এবং নিজের গৃহকে 'পরের বাড়ি' বলে গণ্য করে। নারীর এই অসীম দাসত্ব এবং অপমানের কারণ ব্যাখ্যা করে রোকেয়া বলেন "নারী অকর্মণ্য।" কর্মময় যে জীবন মানুষকে উপযোগিতা দান করে, নারী সেই ভূমিকাবর্জিত। মোহাম্মদ ইয়াসিনকে লেখা এক চিঠিতে রোকেয়া মেয়েদের তুলনা করেছেন 'চিড়িয়াখানায় বন্দী জন্তুদের' সঙ্গে।

জীবনকে অর্থবান করার জন্য এই শোচনীয় দাসত্ব থেকে যে নারীর মুক্তি আবশ্যিক, এ বিষয়ে রোকেয়ার ভাবনায় কোন অস্পষ্টতা বা দ্বিধা ছিলো না। সমকালীন আলোকিত নারীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, তাঁরা নারীর দুর্দশা লাঘব করতে চেয়েছেন মাত্র, সুশিক্ষিত, উপার্জনশীল, স্বাধীন নারী তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি। লেখাপড়া, গৃহকর্ম, সন্তান-লালন পদ্ধতি শিখে আরো ভালো মা এবং স্ত্রী হওয়ার প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা। অর্থাৎ নারীর ঐতিহ্যিক ভূমিকাকে অক্ষুণ্ন রেখে নারী হিসেবে পুরুষদের হাতে আরো বেশি শোষিত হওয়ার এবং তাদের জন্য আরো উপযোগী হওয়ার পরামর্শ তাঁদের। আত্মবিকাশ নয়, সমাজের নামে আত্মত্যাগের আদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা। গৃহকর্ম, রন্ধন, সন্তান লালন, পরিজনের যত্ন ইত্যাদিকে রোকেয়াও নারীর কর্ম বলেছেন, (সম্ভবত ঐতিহ্যিক সমাজের মন রক্ষার্থে) কারণ, রোকেয়া বিশ্বাস করতেন—নারীপুরুষের সমানাধিকারে, গৃহকর্ম শুধু নারীর নয়, পুরুষেরও মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন রোকেয়া (সুলতানার স্বপ্ন)। কিন্তু নারীর জীবন যে এতেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, পুরুষ লেখকেরা নারীদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেন। একে তিনি পুরুষদের স্বার্থপরতা বলে অভিহিত করেন। কারণ কেবল সহিষ্ণুতার প্রশংসা আসলে পুরুষ সমাজের শোষণ এবং দুর্ব্যবহারেরই সমর্থন। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে যিনি স্বামী এবং সংসারের সেবায় আত্মত্যাগ করেন, সমাজের চোখে সেই আদর্শ নারী।

রোকেয়া এই মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই, বল ভগিনী; আমরা আসবাব নই, বল কন্যে; জড়োয়া অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই। সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ।' [২২]

এ বিরাট বিশ্বে নারীর জন্যও রয়েছে বিশাল কর্মক্ষেত্র। নারীর স্থান অন্ত:পুরের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নয়, অন্ত:পুরের বাইরে পুরুষের সমকক্ষরূপে সবকর্ম করার অধিকার নারীর আছে বলে রোকেয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন নারী স্বাধীনতার লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে পুরুষের সমকক্ষতা

Dhaka University Institutional Repository

অর্জন। এ বিষয়ে রোকেয়া বলেন, "স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টার, লেডী জজ- সবই হইব।" [২৩]

নারী পুরুষ নিয়েই সমাজ গঠিত। নারী সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। অর্ধেক অংশকে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ফেলে রেখে কোন সমাজই উন্নতির আশা করতে পারে না। সমাজের প্রয়োজনেই নারীকে আলোর পথে এগিয়ে আসতে হবে। একমাত্র নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বয়ে আনতে পারে জাতীয় কল্যাণ। আর তাই জাতির কল্যাণের জন্যই পুরুষের ন্যায় নারীকেও সমভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে রোকেয়া বলেন, "আমরা সমাজেরই অর্দ্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়ইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই! তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে সর্বত্র আমরা যাহাতে তাহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন— আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাহারা উন্নতি রাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন! এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী সহকর্মিণী সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্ম্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।"[২৪]

সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য নারী জাগরণ আবশ্যিক এবং একবার জাড্য ঘুচিয়ে আন্দোলন শুরু করতে পারলে, রোকেয়া মনে করেন, ক্রমশ সমাজের অনুমোদনেরও অভাব হবে না। কিন্তু ঔচিত্য এবং প্রচলিত আচার অনেক সময়েই মিতালি করে না। নারীমুক্তি তাই অভীষ্ট হলেও ঐতিহ্যিক সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধ তার সহায়ক নয়। রোকেয়া জানেন, 'প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে; জানি; সমাজ মহা-গোলযোগ বাধাইবে জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য 'কৎল'-এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন, জানি, এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি। (এবং ভগ্নিদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি;) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই।'[২৫] তিনি উপলব্ধি করেন যে, পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে অধিকার অর্জন করতে হলে স্বীয় অধিকার সম্পর্কে নারীদের নিজেদেরই সচেতন হতে হবে এবং অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। কারণ পুরুষ কখনোই নিজে থেকে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবে না। তাই তিনি বলেন, 'আমাদের উচিত যে স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি।' [২৬]

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যে মিথ সমাজের পরতে পরতে বিদ্যমান, তা তাঁর মতে মূল্যহীন শ্রদ্ধার অযোগ্য। রোকেয়ার মতানুসারে ধর্ম হচ্ছে পুরুষপ্রবর্তিত ও প্রচারিত জীবনব্যবস্থা এবং ধর্মগ্রন্থগুলি হচ্ছে শক্তিশালী পুরুষ রচিত বিধি বিধানগুলোর লিখিত রূপ যা শাস্ত্রনামে অভিহিত। বিদ্রোহী রোকেয়া ঘোষণা করেন শাস্ত্র ও ধর্মের দোহাই দিয়ে স্মরণাতীতকাল থেকে পুরুষ সমাজ নারীর উপর প্রভুত্ব করে আসছে। তিনি বলেন—

"আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সেরূপ যোগ্যতা কই যে মুনি ঋষি হইতে পারিতেন? যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে. ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাহার রাজত্ব ছিল না।"[২৭] (আমাদের অবনতি)

নারীদের শোষণ করার সুবিধাজনক অবস্থা থেকে পুরুষ সমাজ বিনা বাধায় সরে যাবে, এটা অপ্রত্যাশিত। বস্তুত, সুকঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নারীমুক্তি আসা সম্ভব। এর জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন পুরুষের অন্যায় কর্তৃত্ব ও দুঃশাসন অগ্রাহ্য করা। এই শক্তির প্রেরণা দিতে পারে আত্মশক্তির সম্যক উদ্বোধন। পুরুষের কাছে দয়া ভিক্ষা নয়– অধিকার আদায়, বঞ্চনার ক্রন্দন নয় প্রতিবাদ– রোকেয়ার এই আদর্শই, তাঁকে তাঁর সমকালীন নারীদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

মতিচূর (প্রথম খণ্ডের) তৃতীয় প্রবন্ধ 'নিরীহ বাঙালী।' প্রবন্ধটি 'নবনূর' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ১৩১০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় (১৯০৩) প্রকাশিত হয়।[২৮] এখানে রোকেয়া 'নিরীহ' শব্দটি ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করেছেন। বাঙালি চরিত্রের দোষ-দুর্বলতা, লোভ-স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, পরমুখাপেক্ষিতাকে ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করে তিনি বাঙালিকে আত্মসচেতন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে বেগম রোকেয়া পুরুষের সাথে নারীর সম অধিকার দাবি করে সমাজে নারীরা যে বৈষম্যের শিকার তা তুলে ধরেন, 'পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি, এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশী। যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারিজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার শিক্ষার জন্য দুইজন শিক্ষায়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি.এ. পর্যন্ত) পাশ করে, সেখানে কন্যা (এন্ট্রাস পাশ ও এফ. এ. ফেল) দেড়টা পাশ করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না।"(অর্দ্ধাঙ্গী : মতিচূর, প্রথম খণ্ড)।

Dhaka University Institutional Repository

কারো ব্যক্তিগত ধর্মমতকে আঘাত করা বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা রোকেয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো নারী জাগরণ যার জন্য প্রয়োজন নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসারতা। রোকেয়া অসাম্প্রদায়িক, উদার মানবতাবাদী ছিলেন। ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে নারী সমাজ তথা শোষণমুক্ত মানব সমাজের স্বপ্নই আজীবন দেখেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে রোকেয়ার বক্তব্য, "আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাহাদের ধর্মবন্ধন বা সমাজ বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহিনা। " (অর্দ্ধাঙ্গী : মতিচূর, প্রথম খণ্ড)।

নারী জাতিকে পুরুষের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিদ্রোহে উসকে দেওয়াও রোকেয়ার লক্ষ্য ছিলো না। "অনেকে হয়ত ভয় পাইয়াছেন যে, বোধ হয় একটা পত্নী বিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষকে রাজকীয় কার্য্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার করিবেন। শামলা, চোগলা, আইনকানুনের পাঁজি পুঁথি লুটিয়া লইবেন; অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের শস্যক্ষেত্র দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন, তবে তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে—নিশ্চিন্ত থাকুন।" (অর্দ্ধাঙ্গী : মতিচূর, প্রথম খণ্ড)।

'অর্দ্ধাঙ্গী' (মতিচূর প্রথম খণ্ডের) চতুর্থ প্রবন্ধ। রোকেয়ার নারীবাদী চিন্তা-চেতনার সার্থক প্রকাশ এ প্রবন্ধ। নরের সঙ্গে নারীর সমান মর্যাদার প্রতীক "অদ্ধাঙ্গী' শব্দটি। রোকেয়া পুরুষকে "স্বামী" বলার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, "স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ "প্রভু" হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন না কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্যে ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য-প্রার্থী, মেঘও সেই রূপ তরুর সাহায্য চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, মেঘ আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিণী কাদম্বিনীর 'স্বামী' না কাদম্বিনী তরঙ্গিণীর 'স্বামী'? সামাজিক–নিয়মে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি।

কেহ সুত্রধর, কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিস্টার ডাক্তারের সাহায্যপ্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিস্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিস্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিস্টার ডাক্তারের স্বামী। যদি ইহাদের কেহ কাহাকে "স্বামী' বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে 'স্বামী' ভাবিবেন কেন?' রোকেয়া দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমরা অর্দ্ধাঙ্গী, তাহারা অর্দ্ধাঙ্গ...। আশা করি এখন স্বামী স্থলে অর্দ্ধাঙ্গ শব্দ প্রচলিত হইবে–" (অর্দ্ধাঙ্গী : মতিচূর, প্রথম খণ্ড)।

'মতিচূর' (প্রথম খণ্ডের) পঞ্চম প্রবন্ধ "সুগৃহিণী"। সংসারে একজন নারীর দায়িত্ব অপরিসীম। সংসার নারীর কর্ম ক্ষেত্রের সর্বপ্রধান দিক। সংসার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন একজন সুগৃহিণীর। আর একজন

Dhaka University Institutional Repository

সুশিক্ষিত নারীই পারে সংসার সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে। এ সম্পর্কে বেগম রোকেয়া বলেন, 'সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (mental culture) আবশ্যক।' (সুগৃহিনী : মতিচূর, প্রথম খণ্ড)। এ প্রবন্ধে রোকেয়া গৃহিণীপনার জন্যও যে শিক্ষার প্রয়োজন অর্থাৎ নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন, মেয়েদের যে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে–এই ছিলো রোকেয়ার মূল বক্তব্য। কারণ শিক্ষাই পারবে নারীদের নিজ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করতে এবং সচেতন নারীই হবে নিজ অধিকার আদায়ে সক্ষম।

রোকেয়ার মতে, "গৃহিণীদের ঘরকন্নার দৈনিক কার্য্যগুলি, ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্যও বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন। চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই সমাজের হর্ত্রী, কর্ত্রী ও বিধাত্রী, তাঁহারাই সমাজের গৃহলক্ষ্মী, ভগিনী এবং জননী।"

ঘরকন্নার কাজগুলি প্রধানত এই; (সুগৃহিণী, 'মতিচূর', প্রথম খণ্ড)

(ক) গৃহ ও গৃহ সামগ্রী পরিষ্কার ও সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা।

(খ) পরিমিত ব্যয়ে সুচারুরূপে গৃহস্থালী সম্পন্ন করা।

(গ) রন্ধন ও পরিবেশন।

(ঘ) সূচিকর্ম।

(ঙ) পরিজনদিগকে যত্ন করা।

(চ) সন্তান পালন করা।

এর প্রতিটি কাজ সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য সুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন, "দেখা যায় যে, রমণীর জন্য আজ পর্যন্ত যে সব কর্তব্য নির্ধারিত আছে, তাহা সাধন করিতেও বুদ্ধির প্রয়োজন। অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত পুরুষদের যেমন মানসিক শিক্ষা (mental culture) আবশ্যক, গৃহস্থালীর জন্য গৃহিণীদেরও তদ্রূপ মানসিক শিক্ষা (mental culture) প্রয়োজনীয়।" (সুগৃহিনী: মতিচূর, প্রথম খণ্ড)।

'বোরকা' 'মতিচূর' প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি 'নবনূর' ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৯] এ প্রবন্ধে রোকেয়া সমাজের গোঁড়া বা পর্দা প্রথার কট্টর সমর্থক অংশকে সমর্থন করেছেন, অর্থাৎ এ প্রবন্ধে রোকেয়া বিদ্রোহের বদলে আপোষকামি মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। অথবা বলা যায়, এ হচ্ছে বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে তথা ভবিষ্যৎ নারীদের পথচলাকে সুগম করার জন্যে নারী শিক্ষার প্রয়োজনে (নারীমুক্তি রোকেয়ার মূল লক্ষ্য) স্কুলকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে রোকেয়ার কৌশলী আত্মসমর্পণ ।

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়ার কৌশলী উচ্চারণ, "আমাদের বিশ্বাস যে, অবরোধের সহিত উন্নতির বেশি বিরোধ নাই। উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চ শিক্ষা চাই। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে হইলে এফ. এ., বি.এ. পরীক্ষার জন্য পর্দা ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয় (University Hall)-এ উপস্থিত হইতে হইবে। এ যুক্তি মন্দ নহে। কেন? আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় (University) হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব? যতদিন এই রূপ বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন আমাদের পাশ করা বিদ্যা না হইলেও চলিবে।" (বোরকা : মতিচূর প্রথম খণ্ড)।

পর্দা আর অবরোধ এক কথা নয়। বোরকা প্রবন্ধে রোকেয়া পর্দা অর্থে শালীনতা ও সুরুচি বুঝিয়েছেন। শালীনতা বজায় রেখে সমাজে সবকর্মে নারীদের এগিয়ে যাবার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। সে সময়ে মুসলমান সমাজে যে অবরোধ প্রথা চালু ছিল তার ফলে নারীরা ছিল অন্তঃপুরের চারদেয়ালে বন্দিনী। প্রকৃতির অকৃপণদান মুক্ত আলো বাতাস থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। প্রচলিত অবরোধ প্রথার কঠোর সমালোচনা করে রোকেয়া বলেন, 'এদেশে আমাদের অবরোধ প্রথাটা বেশি কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন। কখন কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবম বর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না।' (বোরকা : মতিচূর প্রথম খণ্ড)।

রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন নারী সমাজের পশ্চাৎপদতার অন্যতম প্রধান কারণ পর্দাপ্রথার তীব্র কঠোরতা। কৃত্রিম পর্দা, অন্যায় অবরোধ প্রথার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী, 'আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই।' (বোরকা : মতিচূর প্রথম খণ্ড)।

রোকেয়ার মতে মুসলমান সমাজ নারীকে অবরোধ বন্দিনী করে শিক্ষাগ্রহণের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার জন্যই তারা সবদিক থেকে পশ্চাদপদ হয়েছে। মুসলমান নারীদের পরাধীনতা, পরনির্ভরশীলতা ও হীনাবস্থার প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সংকীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই, শিক্ষার অভাবে হইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সংকুচিত হইয়াছে।' তিনি আরো বলেন, 'শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি।' (বোরকা : মতিচূর, প্রথম খণ্ড)।

মুসলমান সমাজের অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের কন্যাদের অলঙ্কারের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকেন। রোকেয়া এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, "তাঁহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড় স্বর্ণ মুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান-ভূষণে অলংকৃত করিতে চেষ্টা করিবেন।"

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপ্রেমী, জ্ঞানপিয়াসী রোকেয়া ঘোষণা করেন, 'একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না।'

তাই রোকেয়া পুরুষ সমাজের কাছে দাবী জানান, 'অলঙ্কারের টাকা দ্বারা 'জেনানা স্কুলের' আয়োজন করা হউক।'

'মতিচূর' প্রথম খণ্ডের সপ্তম এবং শেষ প্রবন্ধ 'গৃহ' 'নবনূর' পত্রিকার ২য় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩১১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে রোকেয়া পুরুষ প্রধান সমাজে পুরুষের হৃদয়হীনতা ও নিদারুণ স্বার্থপরতার জন্য নারীর ব্যথা ও বেদনায় জর্জরিত অসহায় অবস্থার ছবি সমাজের সামনে উপস্থাপন করেছেন। স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত কিছু বাস্তব চিত্র তিনি এখানে তুলে ধরেছেন, 'আমদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত নারী গৃহসুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাটিকে আপন ভবন মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়। কুমারী, সধবা, বিধবা— সকল শ্রেণীর অবলার অবস্থাই শোচনীয়।' তিনি পুরুষদের মানসিকতার সমালোচনা করে বলেন, 'সাধারণত পরিবারের প্রধান পুরুষটি মনে করেন গৃহখানা কেবল আমার বাটি, পরিবারস্থ অন্যান্য লোকেরা তাহার আশ্রিতা।' (গৃহ : মতিচূর, প্রথম খণ্ড)।

এই প্রবন্ধে রোকেয়া আরো দেখিয়েছেন বাড়ির সর্বময় কর্তা পুরুষটির ন্যায়-অন্যায় যে আদেশই হোক না কেন নারীকে মেনে নিতে হয়। নারীকে নিজ গৃহেও আশ্রিতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ইসলাম প্রদত্ত অধিকার থেকেও পুরুষ সমাজ নারীকে ছলে বলে কৌশলে বঞ্চিত করে। নারী মাত্রই আমাদের দেশে স্বামী, পুত্র, জামাতা কিংবা দেবরের বাড়িতে অবস্থান করে। সাধারণ নারীর ক্ষেত্রেই শুধু নয়, কোন কোন রাণীর বাসভবনেও পুরুষের অবহেলার জাজ্বল্যমান প্রমাণ উদ্ধার করেছেন রোকেয়া। গৃহের প্রকৃত অধিকারী রাজা অপ্সরা পরিবেষ্টিত হয়ে কলকাতায় থাকেন আর ভিন্নদিকে রাণী "মূর্তিমতি বিষাদ" রূপে নির্জন নিরানন্দ প্রকোষ্ঠে দিন যাপন করেন।

প্রবঞ্চিত নারীর পক্ষে রোকেয়া তাঁর লেখনী পরিচালনা করেছিলেন, পুরুষনিন্দা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু নারীর দুঃখের কথা বলিতে গেলে আপনিই পুরুষনিন্দা হয়। তাই তিনি বলেন 'বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়'— এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে, "ভগ্নীর দুঃখ বর্ণনা করিতে গিয়া ভ্রাতৃনিন্দা হইয়া পড়িয়াছে।"

জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীকে থাকতে হয় পুরুষ অভিভাবকের আশ্রিতারূপে। রোকেয়া তাই দুঃখের সাথে বলেন, 'আমরা যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, অভিভাবকের বাটিতে থাকি। প্রভুদের বাটি যে আমাদিগকে...' 'সর্ব্বদাই রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে রক্ষা করে, তাহা নহে। তবু' (গৃহঃ মতিচূর প্রথম খণ্ড)

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র, সমাজ ও গৃহে পুরুষের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে রোকেয়া অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে উচ্চারণ করেন, 'তাই বলি, গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণকুটির নাই। প্রাণী জগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয় নহে। সকলেরই গৃহ আছে— নাই কেবল আমাদের।' (গৃহ: মতিচূর প্রথম খণ্ড)

মুসলমান সমাজের ন্যায় হিন্দু সমাজের নারীদের অবস্থাও ভাল নয়। পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্যের কাছে হিন্দু নারী অধিকার বঞ্চিতা, গৃহসুখবঞ্চিতা। ভাগ্য বিড়ম্বিত নারীদের দুঃখে কবি মানকুমারী বসু অতিদুঃখে বলেন,

'কাঁদ তোরা অভাগিনী। আমিও কাঁদিব;
আর কিছু নাহি পারি, ক ফোঁটা নয়ন বারি
ভগিনী। তোদের তরে বিজনে ঢালিব।
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব।"

রোকেয়া কিন্তু এ মনোভাবের সাথে একমত হতে পারেন নি। তিনি এ মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, "আমি কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইয়া কাঁদিবার সুরে সুর মিলাইতে পারিতেছি না। আমার ভগ্নীটি অবশেষে সবখানি শক্তি 'কাঁদিয়া মরিতে' ব্যয় করিলেন। ব্যস! ঐরূপ বিজনে অশ্রু ঢালিয়া ঢালিয়াই তো আমরা এমন অবলা হইয়া পড়িয়াছি।" (গৃহ: মতিচূর প্রথম খণ্ড)

'মতিচূর' প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধ সমূহের বিষয়বস্তু বাঙালি মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থানের বর্ণনা এবং নারীর অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ প্রবন্ধগুলো প্রকাশের সাথে সাথে মুসলমান সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রবন্ধগুলোর পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্নজনের লেখা প্রকাশিত হয়। সময়ের চেয়ে অগ্রগামী মানসিকতার অধিকারী রোকেয়া যখন নারী অধিকার আদায়ে দৃঢ়চিত্তে লেখনী চালিয়ে যাচ্ছেন তখন রোকেয়ার সমালোচনা করে এক নারী লেখেন, 'তিনি যেরূপভাবে যথেচ্ছাচারিণী রমণী মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন ও পুরুষ জাতিকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীর পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছে।'[৩০]

১৩১২ বঙ্গাব্দে 'নবনূরে' ভাদ্র সংখ্যার গ্রন্থ সমালোচনায় বলা হয় যে, "'মতিচূরে'র প্রবন্ধগুলি যখন প্রথম 'নবনূরে' প্রকাশিত হয় তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল। সে অবস্থায় তাহাতে যে কিছু ভাল আছে আমরা এমন একটি কল্পনাই মনে স্থান দিতে পারি নাই। এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিত প্রশমিত হইলে পর গ্রন্থখানি পুনরায় পাঠ করি এবং সেই সময়ে 'মতিচূর' সম্বন্ধে হৃদয়ে একটু অনুকূল ধারণা জন্মে। তৎপর সংযতভাবে আর একবার বিষয়গুলির আলোচনা করিতে যাইয়া দেখি, লেখিকার সকল কথা না হইলেও অনেক কথাই নিরেট সত্য। লেখিকা তাহার বক্তব্য ভাল করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই।"[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

'কোহিনূরে' ১৩১৩ বঙ্গাব্দে 'মতিচূর' প্রথম খণ্ড সম্পর্কে শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বলেন, "'মতিচূর' শুধু হিন্দু মোসলেম সমাজকে নহে, সর্বশ্রেণীর পাঠককে ভারতবঙ্গে আলোড়িত করিয়াছে। মুসলমান মহিলা লিখিত সর্ব প্রথম বাঙলা গ্রন্থের এ ক্ষমতা কতদূর বিস্ময়কর, তাহা ভাষায় বুঝান সুকঠিন।" [৩২]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থ 'মতিচূর' (দ্বিতীয় খণ্ড)। গ্রন্থটি ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ৮৬ এ লেয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে গ্রন্থকর্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩১। প্রকাশকাল অনুযায়ী বেগম রোকেয়ার দ্বিতীয় গ্রন্থ ইংরেজিতে লেখা, "Sultana's Dream" — এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল ১৯০৮ সাল। প্রকাশকালের দিক থেকে 'মতিচূর' (২য় খণ্ড) বেগম রোকেয়ার তৃতীয় রচনা।[৩৩]

'মতিচূর' (২য় খণ্ড) এর প্রথম প্রবন্ধ 'নূর ইসলাম' একটি অনূদিত প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি 'এসলাম' পত্রিকার ১৩২২ বঙ্গাব্দ (১৯২৫ সাল) জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। মূল প্রবন্ধটির লেখিকা থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির নেতা মিসেস এ্যানি বেশান্ত। বেগম রোকেয়া এ্যানি বেশান্তের ইংরেজিতে প্রদত্ত বক্তৃতার উর্দু অনুবাদ (মৌঃ হাসেন উদ্দীন কৃত) থেকে প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ করেন। [৩৪]

"সৌরজগত" গল্প হচ্ছে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় রচনা। এই গল্পটি প্রথমে 'নবনূর' পত্রিকার ১৩২২ বঙ্গাব্দের (১৯১৫) ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৫]

এ গল্পের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে অবরোধ প্রথা ও স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী মনোভাবের কঠোর সমালোচনা এবং নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতির পক্ষে সচেতনতা সৃষ্টি। এ গল্পের প্রধান দুই পুরুষ চরিত্র গওহর ও জাফর একই বয়সী এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হলেও চিন্তা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে দুই ভিন্ন লোকের অধিবাসী। গওহর ও জাফরের মাধ্যমে রোকেয়া প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার সংঘাত প্রদর্শন করেছেন। নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতিতে বিশ্বাসী গওহর পত্নী নূরজাহাঁ নয় কন্যা সন্তানের গর্বিত জননী। সুশিক্ষা প্রাপ্ত কন্যারা যে কখনও ধর্মভ্রষ্ট হতে পারে না সেই বিশ্বাসে নূরজাহাঁ অটল। সামাজিক সংস্কার ও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষিত হলেও যে সহজ সাধ্য নয়, এ গল্পের মাধ্যমে রোকেয়া এই সহজ সত্যটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

"সুলতানার স্বপ্ন" রোকেয়ার অন্যতম সৃষ্টি। এটি তাঁর তৃতীয় রচনা। রোকেয়া প্রথমে এটি ইংরেজী ভাষায় রচনা করেন "Sultana's Dream" নামে। ১৯০৫ সালে "Sultana's Dream" রচনাটি "Indian Ladies Magazine" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভাগলপুরের বাঁকা নামক মহকুমায় স্বামীর দুই দিনের অনুপস্থিতিতে তিনি এটি রচনা করেন। প্রত্যাবর্তনের পর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন পাণ্ডুলিপি পাঠ করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রবন্ধটিকে "ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ" (A terrible revenge) বলে অভিহিত করেছিলেন।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

ভাগলপুরের তদানীন্তন কমিশনার ম্যাকফার্সন এই রচনা পাঠ করে মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্তব্য করেছিলেন—"The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality and they are written in perfect English. I wonder if she has foretold here the manner in which we may be able to move about in the air at some future time. Her suggestions on this point are most ingenious."[৩৭]

উল্লেখ্য, "সুলতানার স্বপ্ন" (১৯০৫) যখন রচিত হয় তখন উড়োজাহাজ তো নয়ই, ভারতবর্ষে মোটরগাড়িও চালু হয়নি। সম্ভবত আরো ছয় বছর পরে কলকাতায় প্রথম উড়োজাহাজ আসে। স্মরণীয় ১৯০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বিমান উদ্ভাবন করেন। এই কাহিনী লেখার সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে (১৯৩০ এর ২ ডিসেম্বর)। রোকেয়া তাঁর স্বপ্নের আকাশযানে উড়েছিলেন প্রথম মুসলমান পাইলট মুরাদের সঙ্গে। 'বায়ুযানে পঞ্চাশমাইল' (সফল স্বপ্ন) নামক রচনায় রোকেয়া তাঁর আকাশ ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনাটি রোকেয়ার নারীমুক্তি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির মূর্ত প্রকাশ। এর মাধ্যমে রোকেয়া সমাজে প্রচলিত নারী-পুরুষ সম্পর্কে ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে উল্টে দিয়েছেন। এ রচনা কৌশলী বুদ্ধিমতি রোকেয়ার নারীশক্তি বন্দনার ও পুরুষকে অপদার্থ প্রমাণ করবার এক অভিনব কৌশল। রোকেয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য সংস্কারের মাধ্যমে নারীর সামাজিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন বা সুগৃহিনী হওয়া মাত্র নয়, তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য নারী-পুরুষের সমানাধিকার, প্রয়োজনে "মর্দামহলে" অলস, অকর্মণ অত্যাচারী পুরুষের গৃহ বন্দীত্ব এবং কর্মদক্ষ, সুশৃঙ্খল, বুদ্ধিমান নারী জাতির কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনা সম্পর্কে বলেন–

"'সুলতানার স্বপ্ন' রচনাটিতে পুরুষতন্ত্রকে বহুমুখি আক্রমণে বিপর্যস্ত করে রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত নারীতন্ত্র। নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন নারীস্থান এবং পুরুষকে অবরুদ্ধ করেছেন গৃহাভ্যন্তরে, লিখেছেন ইউটোপিয়া। ইউটোপীয় ভাবকল্পনার মূলে থাকে বিশেষ ধরনের সমাজ। সামাজিক অসাম্য, অন্যায়ের চরম সংশোধন সম্পন্ন করা হয় ইউটোপিয়ায়। আরওয়েল বলেছেন, 'ন্যায়সঙ্গত সমাজের স্বপ্ন মানুষের কল্পনাকে যুগে যুগে দুর্মরভাবে আলোড়িত করেছে, তাকে আমরা স্বর্ণরাজ্য বলতে পারি বা বলতে পারি শ্রেণীহীন সমাজ বা তাকে মনে করতে পারি অতীতের কোন স্বর্ণযুগ, যা থেকে অধপতিত হয়েছি আমরা।" ইউটোপিয়ার উদ্ভব ঘটেছে পশ্চিমে, পূর্বাঞ্চলে কেউ ইউটোপিয়া লেখেননি; এর একমাত্র ব্যতিক্রম রোকেয়া"।[৩৮]

বিস্ময়কর চিন্তা-চেতনা, মনস্কতার অধিকারী রোকেয়া শুধু সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা বা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অথবা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল ছিলেন তা নয়-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জগত সম্পর্কেও ছিল তাঁর অবাধ কৌতূহল। ছিল অনুসন্ধিৎসা। যার প্রমাণ তাঁর "সুলতানার স্বপ্ন" সহ 'সৌর-জগত', 'পদ্মরাগ' বিভিন্ন রচনাবলী। 'সৌরশক্তি'র সাহায্যে রান্না, ধোঁয়াবিহীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

Dhaka University Institutional Repository

রান্নাঘর, আলো-বাতাস সম্পন্ন রন্ধনঘর, সূর্যরশ্মির সাহায্যে শত্রুদমন, কৃত্রিম মেঘ তৈরি করে প্রয়োজনানুযায়ী বৃষ্টিপাত, উড়ন্ত যান–এ সবি রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচায়ক। এ প্রসঙ্গে গবেষক অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল আলমের মন্তব্য স্মর্তব্য;

"পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের প্রগাঢ় প্রভাব রোকেয়ার বিভিন্ন রচনায় লক্ষণীয়। তাঁর সমসাময়িক কোন নারী লেখকের মধ্যে তো নয়ই, পুরুষ লেখকদের লেখাতেও এমন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার নিদর্শন বিরল। রোকেয়ার লেখা অন্য প্রবন্ধ যেমন, 'সৌর-জগৎ', 'পদ্মরাগ' প্রভৃতিতে প্রচুর বিজ্ঞান প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। কলাইবিহীন তাম্রপাত্রে রান্নার কুফলও তিনি বর্ণনা করেছেন, সুগৃহিণী প্রবন্ধে, শিশু পালন প্রবন্ধেও রোকেয়ার বিজ্ঞান মনস্কতার বিপুল পরিচয় রয়েছে। বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রভাব বিশেষভাবে মুদ্রিত হয়েছে তাঁর "Sultana's Dream" রচনাটিতে"।[৩৯]

রোকেয়ার আগেও বিভিন্ন ইংরেজী পত্র পত্রিকায় কতিপয় বাঙালি মহিলার ইংরেজি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা 'বাংলায়' কিছুই লেখেননি। এমনকি তরু দত্ত ইংরেজি রচনায় কৃতিত্ব দেখালেও বাংলায় শুদ্ধরূপে নিজের নামও লিখতে শেখেননি। অরু ও সরোজিণী নাইডুর ইংরেজি রচনার কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। অরু, তরু ও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে রোকেয়ার মৌলিক পার্থক্য এই যে, তিনি বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই সমান দক্ষতায় সাহিত্য রচনা করেছেন এবং এখানেই অন্যদের থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।[৪০]

মিস মেরী করেলী (১৮৫৫-১৯২৪) রচিত 'Murder of Delicia' (১৮৯৬) উপন্যাসের সংক্ষেপিত বঙ্গানুবাদ করেন বেগম রোকেয়া 'ডেলিশিয়া হত্যা' শিরোনামে। 'মতিচূর', দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ রচনা এটি। চিরকুমারী করেলি নারীমুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে শুধু অবহিতই ছিলেন না, তাঁর অনেক রচনায় তিনি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও কোথাও কোথাও বিদ্রোহও ঘোষণা করেছেন। নারীজাতি পৃথিবীর সর্বত্রই নিপীড়িত— এমনকি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উন্নত দেশ ইংল্যান্ডেও নারী নির্যাতিত। ইংল্যান্ডের নির্যাতিত নারী ডেলিশিয়ার সঙ্গে, ভারতবর্ষের এক নির্যাতিত নারীর সাদৃশ্য বৈশাদৃশ্যের পরিমাণ নির্ণয়ই এ গল্পের মূল উদ্দেশ্য। অত্যাচারী পুরুষ সবখানেই এক, কিন্তু অত্যাচারিত ডেলিশিয়া ও মজলুমাতেই যত পার্থক্য। ডেলিশিয়া শিক্ষিত, উপার্জনক্ষম। ফলে তিনি স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং এ জন্যে নত মস্তকে অন্যায় মেনে না নিয়ে তার প্রতিবাদ করেন। পক্ষান্তরে মজলুমা অশিক্ষিত, পরাধীন ও কঠোর অবরোধে বন্দিনী। এমনকি তার আত্মা পর্যন্ত মানসিক দাসত্বে অভ্যস্ত। আত্মসম্মানবোধহীন (মূলত অসহায়) মজলুমা বীভৎস অত্যাচারেও মুখ খোলে না, পদদলিত হয়েও পদতলে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

মেরী করেলির সাথে স্বীয় মতাদর্শের সাদৃশ্যের কারণেই রোকেয়া এ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ করেছিলেন বলে মনে হয়। "Murder of delicia" প্রায় তিন শতাধিক পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ, কিন্তু রোকেয়ার "ডেলিশিয়া হত্যা" মাত্র ছাব্বিশ পৃষ্ঠার।[৪১]

"ডেলিশিয়া স্বাধীনা, রাজার জাতি এবং অন্তঃপুরে বন্দিনী নহেন, আর মজলুমা পরাধীনা, প্রজার জাতি এবং কঠোর অবরোধে বন্দিনী; কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য কতটুকু, অধিক নয়— উভয়ে অবলা। উভয়ে সমাজের অত্যাচারে মর্মপীড়িতা। কিন্তু ডেলিশিয়া বিদূষী এবং মজলুমা নিরক্ষর— এই একটা ভারী পার্থক্য আছে।"[৪২] (ডেলিশিয়া হত্যা : মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড)

অশিক্ষিত ভারতীয় নারী এতই আত্মমর্যাদাহীন যে সে তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন নয়। রোকেয়া তাই পরম ক্ষোভের সাথে উচ্চারণ করেন, "কবে মজলুমা ডেলিশিয়ার মত বীরনারী হইতে পারিবেন?"[৪৩] (ডেলিশিয়া হত্যা : মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড)

'মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম রচনা "জ্ঞানফল"। এটি একটি রূপক কাহিনী। বিবি হাওয়ার নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কাহিনীটি মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআনের সুরা বাকারায় বর্ণিত।

নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং পরাধীনাবস্থায় স্বর্গসুখে থাকার চেয়ে সংগ্রাম সংঘাতময় স্বাধীন জীবন যে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের কাম্য 'জ্ঞানফল' রচনার মাধ্যমে রোকেয়া তা তুলে ধরেছেন। এ রচনায় রোকেয়ার স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত শিক্ষাই যে মানুষকে পরাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে স্বাধীনতাকামী করে তোলে 'জ্ঞানফল' রচনায় সে কথাই তিনি তুলে ধরেছেন। কনকদ্বীপ ও পরীস্থান নামক দুটি দেশের রূপকের আড়ালে বর্ণিত হয়েছে ইংল্যান্ড কর্তৃক ভারত দখলের কাহিনী। রোকেয়া মনে করেন, ইংরেজদের দখলদারিত্বের অবসান হবে তখনই যখন নারীপুরুষ সম্মিলিতভাবে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। পরাধীনতার অবসানে নারী পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে একটি স্বাধীন, সুখী, সমৃদ্ধশালী ভারত। রোকেয়ার ভাষায় 'অতঃপর কনক দ্বীপ পুনরায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ ধনধান্যে পূর্ণ হইল, অধিবাসীগণ পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহারা আর কোনো প্রকার ইন্দ্রজালে ভুলিবার পাত্র নয়। কারণ এখন ললনাগণ জ্ঞানকাননের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছেন।'

সমাজকর্মী রোকেয়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আর্থ-সামাজিক কারণে প্রকাশ্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও পরাধীনতার গ্লানি যে মর্মে মর্মে অনুভব করতেন তারি লিখিত দলিল তাঁর 'জ্ঞানফল' রচনাটি। নারীকে গৃহবন্দী রেখে কোন জাতিই যে পরাধীনতার শিকল মুক্ত হতে পারে না 'জ্ঞানফল'–নামক রূপক রচনাটির মাধ্যমে রোকেয়া সে সত্যকেই তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে গবেষক তাহমিনা আলম বলেন',–"শুধু নারীমুক্তি নয়, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশের মুক্তিও রোকেয়ার কাম্য।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজদের পরাধীনতা থেকে মুক্তির চেতনা সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে রচিত "জ্ঞানফল" নিঃসন্দেহে রোকেয়ার স্বাধীনতাকামী নির্ভীক মানসিকতার পরিচয় বহন করে"।[৪৪]

"'নারী সৃষ্টি' এ গ্রন্থের ষষ্ঠ রচনা। এই রচনাটিকে বেগম রোকেয়া 'পৌরাণিক উপাখ্যান' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 'নারীসৃষ্টি' সম্পর্কে ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি কৌতুকপূর্ণ গল্প এবং হিন্দুদের পৌরাণিক আখ্যানের সূত্রে উপাখ্যানটি রোকেয়া রচনা করেছেন।[৪৫]

তীক্ষ্ণ রসবোধের অধিকারী, ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের সাহায্যে সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরায় সিদ্ধহস্ত রোকেয়ার একটি অসাধারণ রচনা 'নারী সৃষ্টি'। এ রচনায় রোকেয়া কৌতুকপূর্ণ ভাষায় নারীর স্বভাব বর্ণনার পাশাপাশি নারীকে নিয়ে পুরুষের দোদুল্যমান মানসিকতার পরিচয়ও তুলে ধরেছেন।

মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই নারী-পুরুষের এ দ্বন্দ্ব (মানসিক টানাপোড়েন) বলে রোকেয়ার সকৌতূক বিশ্লেষণ।

'নারী সৃষ্টি' রচনাটি সম্পর্কে গবেষক অধ্যাপক শামসুল আলমের মন্তব্য–

'নারীসৃষ্টি' রচনাটিতে রোকেয়ার কৌতুকপূর্ণ মানসিকতার পাশাপাশি গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নারী সৃষ্টির উপাদানেই নিহিত বলে রোকেয়ার সরস উপস্থাপনা। নারীকে বুঝে উঠতে অক্ষম পুরুষের সরল স্বীকারোক্তি; 'কি আপদ, আমি রমণীকে রাখিতে চাহি না, ফেলিতেও পারি না।' "নারীর অসহায়তা এবং নারীর বিষয়ে পুরুষের সিদ্ধান্তহীনতাকে রোকেয়া এখানে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। সরস হাস্য রসিকতায় রোকেয়া এখানে পুরুষের বুদ্ধিগত সীমাবদ্ধতাকে বিদ্রূপের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন"।[৪৬]

এ গ্রন্থের সপ্তম রচনা 'নার্স নেলী' (সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত) একটি উদ্দেশ্যমূলক কাহিনী। রোকেয়ার সাহিত্যসৃষ্টির লক্ষ্যই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য 'নারী মুক্তি'র সাথে সম্পর্কিত। সমাজে শিক্ষার প্রসার না ঘটলে নিরক্ষর নর নারীর জীবনের সার্বিক বিপর্যয় রোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উচিত নিজ নিজ ধর্ম বিষয়ে সম্যকভাবে অবগত হওয়া, নিরক্ষরতার অন্ধকারে অবরুদ্ধ নারী জাতির দুর্দশার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করে রোকেয়া নার্স নেলীর প্রসঙ্গে বলেন—

'নয়ীমা নিজের ধর্ম সম্বন্ধীয় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস কিছুই জানেন না, তাঁহার নির্মল অন্তরে যীশু মহিমার গভীর রেখা অঙ্কিত হইল। তিনি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর কলুষিত হইতে আরম্ভ করিল। যে কখনও অলোক দেখে নাই, তাহার নিকট জোনাকীর আলোই সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয়, নয়ীমার দশাও সেইরূপ।"[৪৭] (নার্স নেলী : মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড)।

'মতিচূর', দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম রচনা 'শিশু পালন'। ১৯২০ খিষ্টাব্দে ৬ এপ্রিল কলিকাতা টাউন হলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে রোকেয়া উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৪৮] এই প্রবন্ধে রোকেয়া শিশুদের বাঁচানোর

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনেই যে মায়েদেরও যত্নের প্রয়োজন তা তুলে ধরেছেন। নারী শিক্ষার প্রয়োজন, বাল্য বিবাহ রোধ, মেয়েদের স্বাস্থ্যের যত্ন এ প্রবন্ধের বিষয়। তিনি বলেন, "যাহা হউক, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার জন্য দুটি বিষয় দরকারী হয়ে পড়েছে দেখছি। প্রথম স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার, দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ রহিত করা। অর্থাৎ মেয়েদের বেশ করে পড়ালেখা শিখাতে হবে। যাতে তারা নিজের শরীরের যত্ন করতে শিখে; আর অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের বিয়ে বন্ধ করতে হবে। আপনারা ভেবে দেখেছেন, সধবা মেয়ে মানুষ বেশিরভাগে মরে কেন? কারণ তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বলে। এখন দেখছি, শিশু রক্ষা করতে হলে আগে শিশুর মাদের রক্ষা করা দরকার। ভাল ফসল পেতে হলে গাছে সার দেয়া দরকার। মেয়েদেরও খাওয়া দাওয়ার একটু যত্ন করবেন। মেয়েদের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় বলে বেচারীদের শুকিয়ে মারবেন না। তারাই হচ্ছে ভবিষৎ গৃহের গৃহিণী, তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী।"[৪৯] (শিশু পালন : মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড)।

'মুক্তিফল' একটি রূপক কাহিনী। পরাধীন ভারতের প্রতীক 'কাঙ্গালিনী', 'মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ডের নবম রচনা এই কাহিনীর মূল চরিত্র কাঙ্গালিনীর অসুস্থতা হলো ভারতের পরাধীনতা, রোগমুক্তি অর্থে হলো স্বাধীনতা লাভ। 'মতিচূর'-দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত আছে যে, 'মুক্তিফল' বিগত ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের পর রচিত হয়েছিল।[৫০]

কাঙ্গালিনী বৃদ্ধ, অসুস্থ, শয্যাগত। তাঁকে বাঁচানোর জন্য মুক্তিফল প্রয়োজন— কিন্তু সে ফল মায়াপুরের রাজার হাতে। কাঙ্গালিনীর পুত্রেরা প্রবীণ, দর্পানন্দ, ধীমান, নবীন সকলেই যার যার মতবাদ অনুযায়ী সাধ্যমতো চেষ্টা করে 'মুক্তিফল' আনতে কিন্তু সফলকাম হয় না। অবশেষে কাঙ্গালিনীর সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমতি কন্যাদ্বয় শ্রীমতি ও সুমতিও ভাইদের সাথে অগ্রসর হয় মুক্তিফল অন্বেষণে। এবারে তাঁর দুঃখমোচনের ব্যাপারে আশাবাদী হয় কাঙ্গালিনী। সরাসরি ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হলেও যে রোকেয়ার মনে প্রাণে কাম্য ছিল স্বদেশের স্বাধীনতা এবং তিনি যে বিশ্বাস করতেন নারীপুরুষের সমবেত চেষ্টায়-ই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব এ রচনাটি তাঁর সে মনোভাবেরই সাক্ষ্য বহন করছে।

বেগম রোকেয়া লিখিত 'জ্ঞানফল' ও 'মুক্তিফল' সম্পর্কে ১৩২৮ অগ্রাহায়ণের 'মোসলেম ভারত'-এ বলা হয়—"'জ্ঞানফল' ও 'মুক্তিফল' দুইটি রূপকথা। ইহাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ের প্রতিবিম্ব আছে। উভয় প্রবন্ধেরই মুখ্য উদ্দেশ্য: নারী জাতিকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সমাজের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহাই পাঠক পাঠিকাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া। গৌণ উদ্দেশ্য: নারী-পুরুষ উভয়কে দেশের কল্যাণের জন্য আত্ম প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করা।" [৫১]

রোকেয়া রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব' এ গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধ। 'সৃষ্টিতত্ত্ব' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৭)-তে পুরুষ সৃষ্টির অবতারণা (গল্প) নামে প্রকাশিত হয়েছিল।[৫২] এ প্রবন্ধে

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়া পুরুষের শারীরিক শক্তির প্রতি ইংগিত করে বুদ্ধিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। "ত্বষ্টিদেবের বর্ণনায়, পুরুষ নির্মাণের সময় আমাকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় নাই। আমার ভাণ্ডারে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ছিল, হস্ত প্রসারণ করিলে যাহা হাতে ঠেকিয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যথা—দন্ত নির্মাণের সময় সর্পের বিষদন্ত আমূল লইয়াছি; মস্তিষ্কের কোষসমূহ (cells) পূর্ণ করিবার সময় গর্দ্দভের গোটা মস্তিষ্কটাই লইয়াছি।" [৫৩] (সৃষ্টিতত্ত্ব : মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড)।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত একটি মাত্র উপন্যাস পদ্মরাগ। উপন্যাসটি ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ১৯২৪ সালে মুদ্রিত হলেও এর প্রায় বাইশ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯০২ সালে লেখা হয়েছিল। গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশে এত দীর্ঘ বিরতির কারণ জানা যায়নি। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন, "প্রায় ২২ বৎসর পূর্বে এই উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছিল। ইহার পাণ্ডুলিপি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পরলোকগত বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম.এ.বি.এল. মহোদয়কে প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তিনি তাহা পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অনেক স্থানে "Beautiful" এবং "Most beautiful" বলিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ইতিপূর্বে 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের কোন অংশ কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই।"[৫৪]

'পদ্মরাগ' অর্থ 'রক্তবর্ণ মনি', অর্থাৎ মূল্যবান সামগ্রী বিশেষ। এ উপন্যাসের মূল চরিত্র 'জয়নব' ওরফে 'সিদ্দিকাকে' "তারিণী ভবনে"র প্রতিষ্ঠাতা তারিণী দেবী প্রথম দর্শনেই 'পদ্মরাগ' নামে অভিহিত করেন। 'পদ্মরাগ' উপন্যাস সম্পর্কে গবেষক তাহমিনা আলম বলেন—

"'পদ্মরাগ' উপন্যাসটিকে বেগম রোকেয়ার 'জীবন স্বপ্ন' সম্পর্কিত উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়"।[৫৫]

'পদ্মরাগ' সম্পর্কে গবেষক শামসুল আলমের মূল্যায়ন—

'নারীমুক্তির একটি পরিকল্পিত আদর্শকে রোকেয়া এই উপন্যাসে বাস্তবায়িত করেছেন। এ উপন্যাসের কাহিনী সরল, জটিলতা মুক্ত। রোকেয়ার সমকালের নিরালোক পরিবেশে আচার-সর্বস্বতার কাছে আত্মসমর্পণের কথা ভাবেননি যে সব অসহায় নারী রোকেয়া তাদের কথাই বলেছেন 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে'।[৫৬] অকালপ্রয়াত ব্যারিস্টার তারিণী চরণ সেনের দ্বিতীয় পক্ষের নিঃসন্তান সপ্তদশবর্ষীয়া বিধবা দীন তারিণী দেবী একটি বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। দেবর, ভাসুর প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি এ কাজ করেন। পরবর্তীকালে তারিণী ভবনের শ্রীবৃদ্ধিতে উৎসাহিতা হইয়া তিনি একটি বিদ্যালয় খোলেন এবং নারী ক্লেশ নিবারণী সমিতি নামে একটি সভা গঠন করেন। ভবনের বিরাট অট্টালিকার এক প্রান্তে বালিকা বিদ্যালয়, অপরপ্রান্তে বিধবা আশ্রম। কিন্তু ক্রমে তাহাকে তৎসংগলগ্ন একটি আতুর আশ্রমও স্থাপন করিতে হইল।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়ার মানস কন্যা ভাগলপুর ঘটনা চক্রে সিদ্দিকা ছদ্মনামে "তারিণী ভবনে" আশ্রয় লাভ করে। এক গ্রীষ্মকালে দীন তারিণী দেবীসহ তারিণী ভবনের কয়েকজন ভগিনী কারসিয়ঙ্গে গেলে সিদ্দিকাও তাঁদের সঙ্গে যান। সেখানে দস্যুলুণ্ঠিত ও দস্যু কর্তৃক আহত এক ব্যক্তিকে সিদ্দিকা আন্তরিক সেবাযত্নে সুস্থ করে তোলেন। এই ব্যক্তিই ছিলেন সিদ্দিকার হারিয়ে যাওয়া স্বামী লতিফ আলমাস। সিদ্দিকা ও লতিফ আলমাস এখানেই পরস্পরের পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ব্যারিস্টার লতিফ আলমাস সিদ্দিকাকে তার সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। দীন তারিণী দেবীর লতিফ আলমাসের সঙ্গে সংসার কোরবার অনুরোধের জবাবে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, সুশিক্ষিত, নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ সিদ্দিকা বলেন, 'সংসার ধর্ম আমার জন্য নহে। সেই যে সম্পত্তি লিখিয়া না পাওয়ার জন্য পদাঘাতে বিতাড়িত হইয়াছিলাম, সে অবমাননা কি করিয়া ভুলিব? তাঁহারা আমার সম্পত্তি চাহিয়াছিলেন, আমাকে চাহেন নাই। আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন? আমি সমাজকে দেখাইতে চাই যে, "সুযোগ" জীবনে একবার ছাড়া দুইবার পাওয়া যায় না। তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমার পদলেহন করিব, সেদিন আর নাই। আমি আজীবন তারিণীভবনের সেবা করিয়া নারীজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব।'

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে পদ্মরাগ নিজের আত্মমর্যাদাবোধকে সমুন্নত রাখে। নারীমুক্তির নবচেতনায় দীক্ষিত পদ্মরাগ আদর্শের নামে বলি না হয়ে নারীমুক্তির পক্ষে কাজ করার সংকল্প ব্যক্ত করে। গবেষক শামসুল আলম-এর মূল্যায়ন—

"ব্যক্তিত্বের অকুণ্ঠিত প্রকাশ ও দ্রোহের বলিষ্ঠ প্রেরণায় রোকেয়ার "পদ্মরাগ" (সিদ্দিকা) অনন্যা।পুরুষের চরণ তলাশ্রয়চ্ছিন্ন নারী হিসেবে, বাংলা কথা সাহিত্যে সিদ্দিকাই প্রথম। রোকেয়ার সমকালে প্রকাশিত আর কোন বাংলা উপন্যাসে নারীর এমন বিদ্রোহ জয়ী হয়নি। কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' (১৯২৯)-এর কুমুর ছিল প্রবল আত্মমর্যাদা। শিক্ষা ও বৈদগ্ধ্য ছিল শাণিত। কিন্তু সেই কুমুরও পরাজয় ঘটেছে সমাজের ঐতিহ্যিক ভূমিকার বেদীমূলে। এদিক থেকেও 'পদ্মরাগ' এর অনন্যতা লক্ষণীয়।"[৫৭]

তারিণী দেবীর তারিণী ভবন ও তারিণী বিদ্যালয়-এর কার্যক্রমের বর্ণনা আমাদের রোকেয়ার জীবনের কর্মকাণ্ডের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে গবেষক তাহমিনা আলম বলেন–"'পদ্মরাগ' উপন্যাসে বর্ণিত তারিণী ভবনের কর্মকাণ্ডের সাথে আমরা রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে'র কার্যকলাপের মিল খুঁজে পাই। তারিণী বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাই রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'-এর।"[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়া বিশ্বাস করতেন 'নারী মুক্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন।' তাঁর রচিত 'পদ্মরাগ'-এর মূল বক্তব্যই হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন। 'পদ্মরাগ'-এ তারিণী কর্মালয়ের চিত্রে দেখা যায় নারীরা—

"কেহ শিক্ষয়িত্রী পদলাভের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন; কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন; কেহ রোগী সেবা শিখেন। ফল কথা; এ বিভাগে রমণীগণ আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জন করিয়া থাকেন।" সকল নারীর মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। তাই তাঁর রচিত "তারিণী ভবনে" সিদ্দিকা, রাফিয়া, ঊষা, হেলেন প্রভৃতি সমাজ-সংসার কর্তৃক নির্যাতিত নারীর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল নারীতে রূপান্তর ও বিকাশ সমগ্র নারীসমাজের জন্যই পরিবর্তন ও বিকাশের দৃষ্টান্ত।

মুসলিম নারী স্বাধীনতার জন্য যদিও রোকেয়া আজীবন সংগ্রাম করেছেন তবুও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারীর মুক্তিই ছিল তার কাম্য। তাই তাঁর রচিত 'তারিণী ভবনে' সকল ধর্ম বর্ণের নারীরা স্থান লাভ করেছে।

রোকেয়ার চিন্তা চেতনা ও জীবন-দর্শনের প্রতিবিম্ব বলা যায় দীন তারিণী দেবীকে। রোকেয়ার কল্পনা মূর্ত হয়ে উঠেছে দীন তারিণীর কর্মকাণ্ডকে ঘিরে। দীনতারিণী দেবীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে 'তারিণী ভবন' ভাগ্য বিড়ম্বিত, সমাজ পরিত্যক্ত, অনাথ, আতুরদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। অথচ সমাজ তাঁর এ আত্মত্যাগের বিনিময়ে তাঁকে কোন সম্মান তো দেয়ই না, বরং নিন্দা কুৎসা করে তাঁর কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে। এ যেন রোকেয়ার জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

'পদ্মরাগ'-এ রোকেয়া শুধু বাঙালী বা ভারতীয় মহিলার নিপীড়িত বা নির্যাতিত জীবনের কথাই বলেননি— ইউরোপীয় মহিলারাও যে সমানভাবে নির্যাতিত তারও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন 'হেলেন ও লেঃ কর্ণেল সিমিল হরেস' কাহিনীর সাহায্যে।

বেগম রোকেয়াও যে সমাজ দ্বারা কতখানি নির্যাতিত ছিলেন তার সাক্ষ্য বহন করে তাঁরই একটি চিঠি—

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর রোকেয়া তাঁর চাচাত বোন মরিয়ম রশীদকে লিখেছিলেন, 'চিঠি না লিখিবার একমাত্র কারণ সময়াভাব। বুঝিতেই পার এখন খোদার ফজলে পাঁচটি ক্লাস এবং ৭০টি ছোট বড় মেয়ে, দুখানা গাড়ি, দুই জোড়া ঘোড়া, সইস, কোচম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি সবদিকে একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোজ সকালবেলা সইসেরা ঠিকমত ঘোড়া মলে কিনা তাও আমাকে দেখিতে হয়। ভগিনীরে; এই যে হাড়ভাঙ্গ' গাধার খাটুনী ইহার বিনিময় কি, জানিস? বিনিময় হইতেছে 'ভাড় লিপকে হাত কালা' অর্থাৎ উনুন লেপন করিলে উনুন তো বেশ পরিষ্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহারই হাত কালিতে কালো হইয়া যায়। আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুল ভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর।"[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়ার 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থটি সাতচল্লিশটি কাহিনীতে বিধৃত অবরোধবন্দিনী নারীদের হাস্যকরতা, বোকামী ও কারুণ্যের বিচিত্র চিত্র। যা রোকেয়ার ভাষায় "কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া অবরোধবাসিনী রচিত হইল।"[৬০] (নিবেদন : অবরোধবাসিনী)।

পর্দা ও অবরোধ প্রসঙ্গে রোকেয়া নানাভাবে বহু আলোচনা করেছেন। বেগম রোকেয়ার সমকালে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীরা ছিল কঠোর অবরোধে বন্দিনী। ব্যক্তিগত জীবনে রোকেয়া নিজেও পাঁচ বছর বয়স থেকে ছিলেন কঠোর অবরোধে বন্দিনী। 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে, পর্দার অবরোধের নিষ্পেষণের জন্যে শুধু পুরুষরাই দায়ী নন, মেয়েদের মানসিকতাতেও অবরোধের সংস্কারটি এমন গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট যে তারা নিজেরাই তা ভাঙতে চান না। কিন্তু নারীর মুক্তি তখনই সম্ভব হবে যখন তারা শুধু অন্তঃপুরের অবরোধ নয়, মানসিক সংস্কারচ্ছন্নতা ও মূর্খতার অবরোধ কাটাতে পারবে। রোকেয়া অবরোধবাসিনী নারীদের অবস্থাদৃষ্টে বলেন, 'আমরা বহুকাল হইতে অবরোধে থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের বিশেষতঃ আমার কিছুই নাই। মেছোনীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, পঁচা মাছের দুর্গন্ধ ভাল না মন্দ?— সে কি উত্তর দিবে?'

"এ স্থলে আমাদের ব্যক্তিগত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিব আশা করি, তাহাদের ভাল লাগিবে।"

এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষের বিরুদ্ধে নহে, মেয়েমানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরাণী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোকে দেখিতে পায় না। বিবাহিতা নারীগণও বাজীকর ভানুমতি তামাসাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দ্দা করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশী পর্দ্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশী পেঁচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই তত বেশী শরীফ।

শহরবাসিনী বিবিরাও মিশনারী মেমদের দেখিলে ছুটাছুটি করিয়া পলায়ন করেন। মেম ত মেম— সাড়ী পরিহিতা খ্রীষ্টান বা বাঙালি স্ত্রীলোক দেখিলেও তাঁহারা অর্গল বন্ধ করেন।"[৬১] (ভূমিকা : অবরোধবাসিনী)।

'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থটিকে নকশা জাতীয় গ্রন্থ বলা যায়। এ গ্রন্থের প্রথম কাহিনী 'সে অনেক দিনের কথা, রংপুর জিলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ নামক গ্রামের জমীদার বাড়িতে (রোকেয়ার বাবার বাড়ি) বেলা আন্দাজ ১ টা-২টার সময় জমীদার কন্যাগণ জোহরের নামাজ পড়িবার জন্য ওজু করিতেছিলেন। সকলের অজু শেষ হইয়াছে কেবল আ খাতুন নান্নী সাহেবজাদী তখনও আঙ্গিনায় ওজু করিতেছিলেন। আলতার মা বদনা হাতে তাঁহাকে ওজুর জন্য পানি ঢালিয়া দিতেছিল। ঠিক সেই সময় এক মস্ত লম্বাচৌড়া কাবুলী স্ত্রীলোক আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত। হায়, হায়, সে কি বিপদ! আলতার মার হাত হইতে বদনা পড়িয়া

Dhaka University Institutional Repository

গেল। সে চেঁচাইতে লাগিল— আঁউ আঁউ! মরদটা কেন আইল'! সেইটুকু শুনিয়াই 'আ' সাহেবজাদী প্রাণপণে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া তাঁহার চাচী আম্মার নিকট গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'চাচী আম্মা! পায়জামা পরা একটা মেয়ে মানুষ আসিয়াছে।' কত্রী সাহেবা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে তোমাকে দেখিয়াছে?' 'আ' সরোদনে বলিলেন, 'হ্যাঁ!' অপর মেয়েরা নামাজ ভাঙ্গিয়া শশব্যস্তভাবে দ্বারে অর্গল দিলেন। যাহাতে সে কাবুলী স্ত্রীলোক এ কুমারী মেয়েদের দেখিতে না পায়। কেহ বাঘ ভালুকের ভয়েও বোধ হয় অমন করিয়া কপাট বন্ধ করে না।"[৬২] (১নং : অবরোধবাসিনী)।

আরো একটি কাহিনী (১৩ নম্বর) 'আজিকার (২৮শে জুন ১৯২৯) ঘটনা শুনুন। স্কুলের একটা মেয়ের বাপ লম্বা চওড়া চিঠি লিখিয়াছেন যে, মোটর বাস তাঁহার গলির ভিতর যায় না বলিয়া তাঁহার মেয়েকে বোরকা পড়িয়া মামার (চাকরাণীর) সহিত হাঁটিয়া বাড়ী আসিতে হয়। গতকল্য গলিতে এক ব্যক্তি চায়ের পাত্র হাতে লইয়া যাইতেছিলেন। তাহার ধাক্কা লাগিয়া হীরার (তাহার মেয়ের) কাপড়ে চা পড়িয়া গিয়া কাপড় নষ্ট হইয়াছে। আমি চিঠিখানা আমাদের জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিয়া ইহার তদন্ত করিতে বলিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উর্দু ভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার অনুবাদ এই 'অনুসন্ধানে জানিলাম, হীরার বোরকায় চক্ষু নাই। অন্য মেয়েরা বলিল, 'তাহারা গাড়ী হইতে দেখে, মামা প্রায় হীরাকে কোলের নিকট লইয়া হাঁটাইয়া লইয়া যায়। বোরকায় চক্ষু না থাকায় হীরা ঠিকমত হাঁটিতে পারে না। সেদিন একটা বিড়ালের গায়ে পড়িয়া গিয়াছিল, কখনও হোঁচট খায়। গতকল্য হীরাই সে পাত্রবাহী লোকের গায়ে ধাক্কা দিয়া তাহার চা ফেলিয়া দিয়াছে।'

দেখুন দেখি, হীরার বয়স মাত্র ৯ বৎসর, এতটুকু বালিকাকে অন্ধ বোরকা পরিয়া পথ চলিতে হইবে! ইহা না করিলে অবরোধের সম্মান রক্ষা হয় না।"[৬৩]

অবরোধবন্দিনী নারীরা মানসিকভাবে এ বন্দীত্বকে কতখানি মেনে নিয়েছিল তা বোঝা যায় রোকেয়া বর্ণিত এ গ্রন্থের ৮নং কাহিনী থেকে; "এক বাড়িতে আগুন লাগিয়াছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করিয়া সমস্ত অলংকার একটা হাত বাক্সে পুরিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, সমবেত পুরুষেরা আগুন নিবাইতেছে। তিনি তাহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া অলংকারের বাক্সটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর খাটের নীচে গিয়া বসিলেন। তদাবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না।"[৬৪]

অবরোধবাসিনীতে বর্ণিত ঘটনাগুলি মনুষ্যত্বের অবমাননায় এমন-ই কলঙ্কিত যে পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। হতবিহ্বল অনেক পাঠক, সমালোচকই এসব ঘটনাকে রোকেয়া কল্পিত বলে মত প্রকাশ করেন। রোকেয়া দৃঢ়তার সাথে বর্ণিত সব ঘটনাকে সত্য বলে জানিয়ে দেন এবং এসব অমানবিক ঘটনার বর্ণনা যে সমাজের সব অমানবিক ঘটনার প্রতিকারার্থেই প্রয়োজন তাও ঘোষণা করেন। তিনি বলেন 'কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না

Dhaka University Institutional Repository

লইয়া অবরোধবাসিনী' রচিত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ অধিকাংশ স্থলে হাসিবেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাঁহাদের মনে সমবেদনার উদ্রেক হইবে'– (নিবেদন : অবরোধবাসিনী)

রোকেয়ার বর্ণনায় তৎকালীন সমাজের নারীদের সামাজিক, পারিবারিক অবমাননার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে গবেষক শামসুল আলম বলেন–

" 'অবরোধবাসিনী'-র কাহিনীগুলোতে তৎকালীন ভারতবর্ষের অবমানিত নারীত্বের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে বলা যায়। এগুলো যে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বিবরণ এ কথাও মিথ্যা নয়। কোথাও কোথাও বর্ণনার অতিরঞ্জন দৃষ্টিকটু হলেও কৌতুক ও সহানুভূতির মিশ্রণে অবরোধের নির্মমতা ও বীভৎসতা বাস্তব হয়ে উঠেছে। লেখিকা অত্যন্ত সরাসরি একটি সামাজিক আতিশয্যকে আক্রমণ করেছেন।"[৬৫]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের রচনাসমূহের মধ্যে প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশী। তিনি বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত প্রবন্ধসমূহ রচনা করেছেন। তাঁর অনেক প্রবন্ধ তাঁর কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাঁর বেশ কিছু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'রোকেয়া রচনাবলী' (প্রথম সংস্করণ) গ্রন্থে 'পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী' শিরোনামে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নানা বিষয়ে রোকেয়া এ প্রবন্ধগুলো লিখেছেন। এ সংকলনে রোকেয়ার সব অগ্রন্থিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বলে সংকলক অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

'রোকেয়া রচনাবলী' মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ-১৪ এপ্রিল ২০০৬-এ সংকলিত অগ্রন্থিত প্রবন্ধ নিবন্ধ এর প্রথম প্রবন্ধ 'কূপমণ্ডুকের হিমালয় দর্শন'। এ প্রবন্ধে রোকেয়ার ভ্রমণপ্রীতির কথা জানা যায়। ভ্রমণকালে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যই নয়, সমাজ সচেতন রোকেয়া সেখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও নারীর সামাজিক অবস্থান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতেন। এ প্রবন্ধটি মহিলা পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যা-১০ম বর্ষ, কার্তিক-১৩১১ তে প্রকাশিত হয়।[৬৬]

রোকেয়া রচিত "রসনা পূজা" ১৩১১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ (২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা) নবনূর পত্রিকায় প্রথম প্রকশিত হয়। 'রসনা' শব্দের অর্থ 'জিহ্বা'। 'পূজা' অর্থ 'উপাসনা'। রসনা পূজার শাব্দিক অর্থ 'জিহ্বার পূজা বা উপাসনা।'[৬৭] ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ (চব্য-চোষ্য লেহ্য পেয়) খাদ্যের প্রতি অত্যধিক আসক্ত। তাদের খাদ্যাসক্তি রসনা পূজার পর্যায়ে পড়ে বলিয়া রোকেয়া অভিমত ব্যক্ত করেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বস্তুর উপাসনা করেন না। কিন্তু রোকেয়ার মতানুসারে ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ রসনা পূজা করে থাকেন। "মুসলমান গৃহের গৃহিণীগণ সকল সময় রসনা পূজার আয়োজনেই ব্যয় করে থাকেন। অন্য কোনদিকে দৃষ্টি দেবার মত অবসর তাদের মেলে না, জ্ঞানচর্চা তো আমরা জানি না। সামান্য সূচীকার্য ও রন্ধন প্রণালী আমাদের শিক্ষণীয়। ৫০০ রকমের আচার চাটনী, ৪০০ প্রকার মোরব্বা প্রস্তুত করিতে জানিলেই সুগৃহিনী বলিয়া পরিচিত হইতে পারা যায়।"

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়ার আর একটি অভ্যক্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'চাষার দুক্ষু'। এ প্রবন্ধটি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকার" ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।[৬৮]

স্বদেশ প্রেমিক, মানবতাবাদী রোকেয়া মানসের মূর্ত প্রকাশ এ প্রবন্ধ। এ দেশের চাষার দুঃখ দারিদ্র্যে বিচলিত রোকেয়ার বর্ণনা— 'কৃষক কন্যা জমিরণের মাথায় বেশ লম্বা চুল ছিল। তার মাথায় প্রায় আধ পোয়াটাক তেল লাগিত। সেই জন্য যেদিন জমিরণ মাথা ঘষিত, সেদিন মা তাকে রাজবাড়ী লইয়া আসিত। আমরা তাকে তেল দিতাম। হা অদৃষ্ট ! যখন দুই গণ্ডা পয়সায় এক সের তৈল পাওয়া যাইত, তখনও জমিরণের মাতা কন্যার জন্য এক পয়সার তৈল জুটাইতে পারিত না।'

"রঙ্গপুর জেলার কোন কোন গ্রামের কৃষক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয়া সত্ত্বেও ভাত না পাইয়া লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারী ও পাটশাক, লাউশাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত। আর পরিধান করিত কি, শুনিবেন? পুরুষেরা বহুকষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কিংবা ৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজেরা কৌপিন ধারণ করিত।"

রোকেয়ার মতানুসারে কৃষকদের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য দেশীয় শিল্প বা কুটির শিল্পের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন এবং সেইসঙ্গে নারী পুরুষের নির্বিশেষে শিক্ষার প্রয়োজন।

তবে কৃষক সমাজের দুঃখ দুর্দশার চিত্র তুলে ধরলেও এবং তাদের দুর্দশায় বিচলিত বোধ করলেও যে সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে তাদের এ দুরবস্থা, শ্রেণী বৈষম্যভিত্তিক সে সমাজ ব্যবস্থার কোন উল্লেখ শুধু এ প্রবন্ধে নয়, রোকেয়ার কোন প্রবন্ধেই নেই। এবং নারীমুক্তির ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ রোকেয়া নারীমুক্তি প্রশ্নেও সমাজ সমস্যার গভীরে না গিয়ে, বৈষম্য ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন না চেয়ে নারী-পুরুষের মানসিক সংস্কারের মাধ্যমে নারী সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন।

'এন্ডিশিল্প' প্রবন্ধটি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'-র ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ক'র্তিক সংখ্যায় (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।[৬৯]

তথ্যপূর্ণ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবতা নির্ভর এ প্রবন্ধে রোকেয়া এন্ডিশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রংপুরের লুপ্ত প্রায় এন্ডিশিল্পের বর্ণনা দিয়েছেন।

'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'-এর ম্যানেজিং কমিটির ১৯৩১ সালের ৮ মার্চের অধিবেশনে স্কুলের সেক্রেটারি কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধটি 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলমান' শিরোনামে 'মাসিক মোহাম্মদী'র ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের (১৯৩১ সাল) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৭০]

এ প্রবন্ধে রোকেয়া হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি মুসলমান সমাজের নারীদের স্বসম্প্রদায়ের ধর্মীয় আদর্শানুসারে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বারোপ করে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের উন্নতির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণে সভ্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

এ ব্যাপারে সভ্যদের নিষ্ক্রিয়তায় রোকেয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আপনারা সকলেই জানেন যে, এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটা না থাকলে আমি মরে যাব না। এমনটি নিশ্চয় হবে না যে—

"ঘুঘু চরবে আমার বাড়ি,
উনুনে উঠবে না হাঁড়ী,
বৈদ্যতে পাবে না নাড়ী—
অন্তিম দশায় খাবি খাব।"

এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই ? চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়, চাই স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য নয়, চাই, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য'। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' শব্দ দুটির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয়, তবে সাইন বোর্ড থেকে ও শব্দ দুটি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ আমার কোন বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দুর্দশার আশঙ্কায় আমি শংকিত হব; কিংবা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন; এই স্কুল সম্বন্ধে মাথা ব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়া এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয় রূপে গঠিত করুন।"

'বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল' (সফল স্বপ্ন) প্রবন্ধটি রোকেয়ার বায়ুযানে আকাশ ভ্রমণের কাহিনী। প্রবন্ধটি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা "মোয়াজ্জিন" পত্রিকায় (ত্রৈমাসিক) প্রকাশিত হয়।[৭১]

'নারীর অধিকার" প্রবন্ধটি একটি অসমাপ্ত রচনা। বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পরে 'মাহেনও' পত্রিকার ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ রচনাটি সংগ্রহের বিষয়ে মোশফেকা মাহমুদের বর্ণনা, '৯ই ডিসেম্বর (১৯৩২ সাল) ভোররাত্রে তিনি (বেগম রোকেয়া) ইন্তেকাল করেন। সে রাত্রেও তিনি ১১টা পর্যন্ত তাঁর টেবিলে বসে কাজ করেছিলেন। যে টেবিলে তিনি শেষ লেখাপড়ার কাজ করে গিয়েছিলেন সেখানে পরদিন এই অসমাপ্ত লেখাটি পেপার ওয়েটের নীচে দেখা গিয়েছিল।'

এ প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া পুরুষের তুচ্ছ কারণে স্ত্রী তালাক ও বহু বিবাহের প্রবণতাকে কঠোর সমালোচনা করেছেন, এ প্রবন্ধে রোকেয়া সরাসরি প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে আঘাত করে প্রশ্ন

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। 'আমাদের ধর্মমতে বিবাহ সম্পন্ন হয় পাত্র পাত্রীর সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুন বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় একতরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা।'

রোকেয়ার উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আরো পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'পঁয়ত্রিশ মন খানা' শীর্ষক রচনায়। এ প্রবন্ধটি 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার ঈদ সংখ্যা ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (১৯২৭ সালের নভেম্বর সংখ্যা)[৭২] প্রকাশিত হয়। রোকেয়ার সমকালে বাঙালি মুসলিম সমাজে 'আশরাফ ও আতরাফ' শ্রেণীভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল। রোকেয়া নিজে যদিও আশরাফ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন— কিন্তু তিনি এ প্রথা সমাজ থেকে দূর করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, "এতবড় আস্পর্ধা! মানুষকে ঘৃণা! ইচ্ছা হইল তখনই আশরাফদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দেই। কিন্তু তাহাতে একটু অসুবিধা ছিল। অসুবিধা এই যে, আমি নিজে আশরাফ-এর তালিকায় নাম লিখাইয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং জেহাদ ঘোষণা করিলে যদি প্রথম তরবারি আমারই গলায় পড়ে। তবে যে সমাজ— সংস্কারের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সবই সাফ হইয়া যাইবে।"

সামাজিক দুর্নীতি, অসাম্য ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে নিয়ত প্রতিবাদী রোকেয়া প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস লেখার পাশাপাশি কবিতাও লিখেছেন। যদিও তা সংখ্যায় অল্প। রোকেয়া মানস মূলত যুক্তিবাদী এবং তাঁর লেখাসমূহ উদ্দেশ্যমূলক। যার জন্য তাঁর লেখায় প্রবন্ধরই সংখ্যাধিক্য।

রোকেয়ার প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'বাসিফুল'। কবিতাটি কবি সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর' মাসিক পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় (১৩১০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি একটি রূপকধর্মী কবিতা।[৭৩] আদরের (ভাইপো) ভাইয়ের ছেলে হারিয়ে পিসিমার হৃদয়ের হাহাকার এ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। 'ভাইপো'-র প্রতীক হলো 'বাসিফুল'। যা অকালেই ঝরে গেছে।

"শশধর" কবিতাটি সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত "নবনূর" পত্রিকার ১৩১০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৭৪] এ কবিতায় কবির ব্যক্তিহৃদয়ের হাহাকার বর্ণিত হয়েছে। এ কবিতার সঙ্গে তুলনীয় রোকেয়ার প্রথম প্রবন্ধ "পিপাসা", দুটি রচনাই ব্যক্তি হৃদয়ের দুঃখ-বেদনা-শোকোচ্ছ্বাসময়।

রোকেয়া রচিত "প্রভাতের শশী" কবিতাটিতে {'মহিলা', (বৈশাখ ১৩১১)}তাঁর পরোপকারী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'পরিতৃপ্তি' কবিতাটিকে (মহিলা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১)[৭৫] রোকেয়ার জীবন দর্শন সম্বলিত কবিতা বলেই উল্লেখ করা যায়। রোকেয়া চিন্তায়–"

"অনেকেই ভাবে তৃপ্তি বলে মনে হয়,
কিছুতেই নাশিতে নারে অতৃপ্তি দুর্জয়!
তৃপ্তি লভিবার তরে এটা সেটা লাভ করে,

Dhaka University Institutional Repository

শুধু মনের ভ্রম আর কিছু নয়।

তৃপ্তি বিধাতার দান, তৃপ্তি দিয়ে যে পরাণ

বিধি তুষিয়েছে— তৃপ্তি সেইখানে রয়।"

কবিতাটি বিখ্যাত পারস্য কবি শেখ মুসলেহউদ্দীন সাদীর "গুলিস্তা" নামক গ্রন্থের অংশবিশেষ অবলম্বনে রচিত। গদ্যে বিবৃত বিষয়টিকে কবিতায় উপস্থাপিত করেছেন রোকেয়া।

"নলিনী ও কুমুদ" কবিতটি 'নবনূর' পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ১৩১১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৭৬] এখানে কুমুদ ও নলিনী রূপকে রোকেয়া মানসের দ্বন্দ্ব প্রকাশ লাভ করেছে বলে মনে হয়।

একাকী জীবন ভার বহন করে নলিনী শ্রান্ত ও ক্লান্ত। জীবন তার কাছে,

"দুর্বল হৃদয় পারে না বহিতে দারুণ যন্ত্রণা হেন;

জীবন-সর্বস্ব হারায়েছি যদি, পরাণ যায় না কেন?'

অপরদিকে শশধর প্রণয়ী কুমুদ সখী নলিনীকে বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শনের আহ্বান জানায় কিন্তু প্রত্যুত্তরে নলিনী মরণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। "হায়! যম আর কতক্ষণ হবে অপেক্ষা করিতে মোরে?" একাকী জীবনভার বহনে ক্লান্ত রোকেয়া মরণের আকাঙ্ক্ষা করেন কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমী, মানবপ্রেমী রোকেয়া মানবসেবার মাঝেই জীবনের সার্থকতা খোঁজেন।

রোকেয়া রচিত 'স্বার্থপরতা' (মহিলা আষাঢ়, ১৩১১)[৭৭] কবিতাটিতে রোকেয়া বলেন", মানুষ তার স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে থাকে —"

"খল সুখী হয় চাতুরী কৌশলে

ফিরে সর্ব্বনাশ তরে,

লোক হিতকর চিন্তায় সুজন

স্বর্ণসুখ লাভ করে।

পাষণ্ড নিষ্ঠুর দুর্বলে পীড়িয়া

হয় চরিতার্থ হায়।

দয়াবীর জন মুছায়ে পরের

শোকাশ্রু সান্ত্বনা পায়।

গুবরে পোকা যত ভালবাসে শুধু

ঘৃণিত দুর্গন্ধ ভার।

মধু বা ভ্রমর ভালবাসে ফুল,

ফুলের অমিয় ধারা।

Dhaka University Institutional Repository

তাই বলি, রুচি যেমন যাহার
সেইরূপ সুখ তার
সবে স্বার্থপর, 'পরার্থপরতা'
কথা শুধু ছলনার।"

"নবনূর" পত্রিকায় প্রকাশিত রোকেয়া রচিত সর্বশেষ কবিতা "কাঞ্চনজঙ্ঘা"। কবিতাটি উক্ত পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা, (১৩১১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়)[৭৮] প্রকাশিত হয়।

"কাঞ্চনজঙ্ঘা" পর্বতশৃঙ্গটি বছরের বেশিরভাগ সময় মেঘের আড়ালে থাকে। এর সৌন্দর্যদর্শন সবার ভাগ্যে ঘটে না। মাসাধিককাল অপেক্ষার পর কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্যদর্শনে মুগ্ধ কবির আনন্দোচ্ছাসের প্রকাশ এ কবিতাটি।

রোকেয়া রচিত "কাঞ্চনজঙ্ঘা" নামক অপর কবিতাটিও প্রকাশিত হয় 'মহিলা' দশম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায়। এ কবিতায় রোকেয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকনের পর স্রষ্টার মহিমার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন——

"ধন্য সেই মহাশিল্পী, করি তারে পরণাম
যাঁহার কৃপায় মম পূর্ণ হল মনস্কাম।"

"প্রবাসী রবীণ ও তার জন্মভূমি" কবিতায় (মহিলা, মাঘ, ১৩১১) প্রবাস জীবন-যাপনকালে মাতৃভূমির প্রতি প্রবল আসক্তি এবং প্রবাসের দুঃসহ মর্মপীড়ার ভয়াবহতা বর্ণিত হয়েছে।[৭৯] স্বদেশপ্রেমিক রোকেয়া স্বদেশের ও সমাজের ক্রটি বিচ্যুতি নির্দেশ করে তীব্র সমালোচনা করেছেন আবার সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করে সুচিন্তিত পরামর্শও দিয়েছেন।

"সওগাত" কবিতাটি 'সওগাত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ কবিতার মাধ্যমে রোকেয়া 'সওগাত' পত্রিকাকে সাহিত্য জগতে সাদর অভ্যর্থনা জানান। 'সওগাত' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে ১৩২০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে।[৮০]

রোকেয়া সারাজীবন শুধু নারী জাতির নয়, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করেছেন। তাই দেশের স্বাধীনতার দাবীতে সংগ্রামী নেতৃত্বকে রোকেয়া যেমন অভিনন্দন জানিয়েছেন, অন্যদিকে ভণ্ড নেতাদের প্রতি তীব্র ধিক্কার উচ্চারণ করেছেন তাঁর "আপীল" কবিতাটিতে। এই কবিতার রচনাকাল ফাল্গুন ১৩২৮। এটি একটি ব্যঙ্গ কবিতা। কবিতাটি ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা "সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৮১] বেগম রোকেয়ার দেশাত্মবোধ ও সমকালীন রাজনীতি সচেতনতা তাঁর এ কবিতায় প্রতীয়মান।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী বিপ্লবী কানাইলালের ফাঁসীর আদেশকে উপলক্ষ করে রোকেয়া রচনা করেন "নিরুপম বীর" কবিতাটি। 'সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশিত এটি তাঁর সর্বশেষ কবিতা। কবিতাটি "ধূমকেতু" পত্রিকার ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় (৫ আশ্বিন, ১৩২৯) প্রকাশিত হয়েছিল।[৮২] প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও দেশের স্বার্থের প্রতি এবং দেশের স্বার্থরক্ষাকারী দেশপ্রেমিকদের প্রতি ছিল রোকেয়ার সুগভীর শ্রদ্ধা। তারি নিদর্শন এ কবিতা। দেশপ্রেমিক কানাইলালের প্রতি রোকেয়ার শ্রদ্ধার্ঘ এ কবিতা।

রোকেয়ার সাহিত্য সাধনার কাল তিন দশক : ১৯০১-৩২। মাঝে পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশে কিছুটা বিরতি আমরা লক্ষ্য করি। প্রকাশে বিরতি থাকলেও রচনায় বিরতি ছিলো না। রোকেয়ার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ঘটনা (দুই শিশু সন্তান, স্বামী, পিতা-মাতার মৃত্যু) তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে কিছুটা বিঘ্নিত করলেও দমিত করতে পারেনি। এবং পরবর্তী জীবনে তিনি স্কুল পরিচালনার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও অব্যাহত রাখেন।

রোকেয়ার সাহিত্যচর্চার মূলে ছিল তাঁর 'নারী মুক্তি'-র স্বপ্ন। নারী-পুরুষের সমানাধিকার অর্জনের লক্ষ্যেই ছিল তাঁর সমস্ত কর্মপ্রয়াস নিবেদিত। সাহিত্যচর্চাও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। শুধু বাঙালি মুসলিম নারী বা ভারতীয় নারীই নয়, সমগ্র বিশ্বের নারী সমাজের মুক্তিই ছিল রোকেয়ার স্বপ্ন। বিশ্ব-নাগরিক রোকেয়া বিভিন্ন রচনায় পৃথিবীর নানা প্রান্তের নারীদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী, এবং তথাকথিত স্বাধীন নারীদের মর্মবেদনার চিত্র তুলে ধরেছেন অত্যন্ত দরদী মন দিয়ে। অসাম্প্রদায়িক, উদার মানবতাবাদী রোকেয়া 'নারীমুক্তি'-কে গ্রহণ করেছিলেন জীবনের ব্রত হিসেবে। সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক রোকেয়া সম্পর্কে গবেষক তাহমিনা আলমের মূল্যায়ন–

"রোকেয়ার মধ্যে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাবপ্রবণতা ও গভীর অনুভূতি লক্ষ্য করি। তাঁর রচনার অধিকাংশ স্বীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তাঁর সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পরিবেশ, ধর্মীয় উপলব্ধির তন্ময় উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণে তাঁর রচনা পরিপূর্ণ। রোকেয়ার রচনায় বিরাট ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভের আনন্দ ছাড়াও বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রগতি ও বিকাশের ঐতিহাসিক উপাদানসমূহেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর চিন্তা-চেতনায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গভীর অনুভূতি, নির্ভীকতা, প্রগতিশীলতা, যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি ও সমাজকে সংস্কার করার মানসিকতা। বেগম রোকেয়া ছিলেন তাঁর সময়কালের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং তাঁর চিন্তা-চেতনার ধারা বাঙালি মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে সমাজকে প্রগতিশীলতার পথে এগিয়ে নিয়েছিল এবং সূচনা করেছিল নারীর অধঃপতিত অবস্থা উন্নয়নের জন্য নারীমুক্তি আন্দোলন।"[৮৩]

বাঙালি জাতির বিশেষ করে মুসলিম বাঙালি সমাজের এক ক্রান্তিলগ্নে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আবির্ভাব। যুক্তির কস্টিপাথরে যাচাই করে তিনি পথ চলেছেন। যুক্তি-বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর রোকেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যরাজী। তাঁর কর্মজীবন বার বার ঐতিহাসিক সমাজ বাধাগ্রস্ত করেছে। রোকেয়া জানতেন– সংঘর্ষে শক্তি ক্ষয়। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রোকেয়া তাই বেছে নেন কৌশলী অবস্থান। মোল্লাতন্ত্রকে সন্তুষ্ট করতে লেখেন 'বোরকা' প্রবন্ধ। লক্ষ প্রাণকে আলোর পথে আনতে, নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেছে নেন অন্ধকার অবরোধের বন্দিনী জীবন। স্বীয় কার্যের সাফল্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত রোকেয়া বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সরাসরি আক্রমণের লক্ষবস্তু হলেও পরিচয় দেন আশ্চর্য সহনশীলতার।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে নারীত্বের অবমাননায় ব্যথিত রোকেয়ার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা নারী মুক্তি' অর্জন। এ লক্ষ্যেই তাঁর সকল কর্মপ্রয়াস নিবেদিত। সমাজকর্মী রোকেয়া, সাহিত্যিক রোকেয়া, শিক্ষাব্রতি রোকেয়া বিভিন্ন রূপে রোকেয়ার সকল কর্মই তাঁর অভীষ্ট 'নারীমুক্তি' অর্জন লক্ষ্যে নিবেদিত।

**তথ্যসূত্র :**


১। শ. ম. সাইফুল ইসলাম– রোকেয়ার লড়াই : বিজ্ঞান চেতনা, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা জুলাই– সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩১।

২। হুমায়ুন আজাদ– পুরুষতন্ত্র ও রোকেয়ার নারীবাদ : নারী, আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ–২৮৪।

৩। আব্দুল মান্নান সৈয়দ– বেগম রোকেয়া : অবসর প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৭।

৪। ঐ, পৃ–৩৮।

৫। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ১৬৪।

৬। ঐ, পৃ. ১৬৪।

৭। ঐ, পৃ. ১৬৪।

৮। ঐ, পৃ. ১৬৪।

৯। মোতাহার হোসেন সুফী– বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য– সুবর্ণ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০১, পৃ–৫৯।

১০। আবদুল মান্নান সৈয়দ– বেগম রোকেয়া : অবসর, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ১০১।

১১। তাহমিনা আলম– বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা–চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

১২। আবদুল মান্নান সৈয়দ– বেগম রোকেয়া : অবসর, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ২১।

১৩। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ– ১৯৮৯, পৃ. ১৭২।

১৪। আব্দুল মান্নান সৈয়দ– বেগম রোকেয়া : অবসর, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ২১।

১৫। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ১৭৩।

১৬। তাহমিনা আলম– বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা–চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, পৃ. ৩৩।

১৭। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন– 'মতিচূর' প্রথম খণ্ড, স্ত্রী জাতির অবনতি : রোকেয়া রচনাবলী, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল, ১৪ এপ্রিল, ২০০৬।

১৮। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : রোকেয়া রচনাবলী, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল, ১৪ এপ্রিল, ২০০৬।

১৯। ঐ

২০। ঐ

২১। ঐ

২২। ঐ

২৩। ঐ

২৪। ঐ

২৫। ঐ

২৬। ঐ

২৭। ঐ

২৮। মোতাহার হোসেন সুফী – বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য, সুবর্ণ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল-২০০১, পৃ. ৮৭।

২৯। ঐ পৃ. ১০০।

৩০। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩১। তাহমিনা আলম– বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, পৃ. ৫৫।

৩২। ঐ পৃ. ৫৬।

৩৩। মোতাহার হোসেন সুফী – বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য, সুবর্ণ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল-২০০১, পৃ. ১৩৬।

৩৪। ঐ পৃ. ১০৮।

৩৫। ঐ পৃ. ১১১।

৩৬। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ২০৯।

৩৭। ঐ পৃ. ২০৯।

৩৮। হুমায়ুন আজাদ– নারী, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর–১৯৯৫, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃ, ২৯৩।

৩৯। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ২১৫।

৪০। ঐ পৃ. ২১৭।

৪১। ঐ পৃ. ২০৭।

৪২। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন– রোকেয়া রচনাবলী, 'ডেলিশিয়া হত্যা' : 'মতিচূর' (প্রথম খণ্ড) : মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশকাল ১৪ এপ্রিল, ২০০৬।

৪৩। ঐ পৃ.

৪৪। তাহমিনা আলম– বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, পৃ. ৬৩।

৪৫। মুহম্মদ শামসুল আলম– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ২১৮।

৪৬। ঐ পৃ. ২২০।

৪৭। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন– রোকেয়া রচনাবলী, 'নার্স নেলী' : 'মতিচূর' (প্রথম খণ্ড) : মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশকাল ১৪ এপ্রিল, ২০০৬।

৪৮। মোতাহার হোসেন সুফী – বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য, সুবর্ণ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল-২০০১, পৃ. ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪৯। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন- রোকেয়া রচনাবলী, 'সৃষ্টিতত্ত্ব' : 'মতিচূর' (প্রথম খণ্ড) : মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশকাল ১৪ এপ্রিল, ২০০৬।

৫০। তাহমিনা আলম- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, পৃ. ৬৩।

৫১। ঐ পৃ. ৬৫।

৫২। মুহম্মদ শামসুল আলম- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ২২৮।

৫৩। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন- রোকেয়া রচনাবলী, 'সৃষ্টিতত্ত্ব' : 'মতিচূর' (প্রথম খণ্ড) : মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশকাল ১৪ এপ্রিল, ২০০৬।

৫৪। মোতাহার হোসেন সুফী - বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য, সুবর্ণ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল-২০০১, পৃ. ১৪৬।

৫৫। তাহমিনা আলম- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, পৃ. ৭০।

৫৬। মুহম্মদ শামসুল আলম- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ২৪৯।

৫৭। ঐ পৃ. ২৪৯।

৫৮। তাহমিনা আলম- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, পৃ. ৫৯।

৫৯। মোশফেকা মাহমুদ- 'পত্রে রোকেয়া পরিচিতি', বাংলা একাডেমী- প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পৃ. ১৪।

৬০। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন- রোকেয়া রচনাবলী (নিবেদন):, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল, ১৪ এপ্রিল, ২০০৬।

৬১। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন- রোকেয়া রচনাবলী (ভূমিকা) :, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল, ১৪ এপ্রিল, ২০০৬।

৬২। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন- রোকেয়া রচনাবলী (অবরোধবাসিনী ১নং ঘটনা) :, মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল, ১৪ এপ্রিল, ২০০৬।

৬৩। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন- রোকেয়া রচনাবলী : (অবরোধবাসিনী ১৩নং ঘটনা), মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল, ১৪ এপ্রিল, ২০০৬।

৬৪। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন- রোকেয়া রচনাবলী (অবরোধবাসিনী ৮নং ঘটনা), মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল, ১৪ এপ্রিল, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫। মুহম্মদ শামসুল আলম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ২৩৬।

৬৬। ঐ পৃ. ২৭২।

৬৭। মোতাহার হোসেন সুফী – বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য, সুবর্ণ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল-২০০১, পৃ. ১৮৭।

৬৮। ঐ পৃ. ১৯২।

৬৯। ঐ পৃ. ১৯৫।

৭০। ঐ পৃ. ২১৬।

৭১। ঐ পৃ. ২২১।

৭২। ঐ পৃ. ২৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

# সমকালে রোকেয়া

"মিসেস আর. এস. হোসেনের প্রতিভা একালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান অন্তঃপুরে যদি এ হেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা ও লিপিকুশলতার জন্ম হয়, তবে আজো ভয় কেন বাংলার মুসলমানের ঘোচে না? তবে আজো কেন নিজেকে পরিবেষ্টনের সন্তান ও জগতের অধিবাসী বলে পরিচিত করবার সাহস তার হয় না।"

"বুদ্ধির মুক্তি" আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব 'শিখা' গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য কাজী আবদুল ওদুদ শুধু বাঙালি মুসলমান মহিলা নয়, সমগ্র মুসলমান সমাজে রোকেয়ার ভূমিকা প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেন।[১]

"যাঁরা নতুনের উদ্ভাবক ও প্রবর্তক, তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা ও কাজ করে যাওয়াতেই যত বিপদ। প্রত্যেক জেনারেশনই বিশ্বাস করে, এই অসুবিধা অতীতের ব্যাপার; কিন্তু প্রত্যেক জেনারেশনই কেবল অতীতের নব-প্রবর্তকদের প্রতিই সহনশীল। যাঁরা সমকালীন তারা একই ভাবে নির্যাতিত। সমকালীনদের বেলায় সহনশীলতার নীতি অনুসৃত হয়েছে, এমন কথা প্রায় কখনও শোনা যায় না'–বার্ট্রান্ড রাসেল (সূত্রঃ আবুল কাসেম ফজলুল হকঃ বেগম রোকেয়া ও উত্তরকাল, আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ– জুন ১৯৯৩, পৃঃ ১৯৮।"

রোকেয়ার সময়ে রোকেয়া মূল্যায়িত হয়েছেন মুষ্টিমেয় শুভবুদ্ধিসম্পন্নদের দ্বারা আর আক্রান্ত, নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হয়েছিলেন সমগ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা। ধর্মের আশ্রয়ে নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখার চিরায়ত যে শৃঙ্খল পড়ানো হয়েছিল তা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছেন রোকেয়া, উন্মোচিত করেছেন ভণ্ডামির চাদর আবৃত ধর্মের প্রকৃত রূপ। ধর্মের সঙ্গে নারী অধস্তনতার সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে। তিনি বলেছেন, "আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন...এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।....। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ সতীদাহ।"[২] (আমাদের অবনতি)।

এভাবে সমসাময়িক সমাজ ও সমাজের অতীত ইতিহাসপ্রাজ্ঞ রোকেয়া নারী সমাজের অবরোধ, বঞ্চনার ইতিহাস উন্মোচন করেছেন। তাঁর এ সাহসী কর্থাবার্তা ধর্মাশ্রয়ী কূপমণ্ডূক সমাজের নিকট সহজে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ফলে প্রথাগত সমাজ রোকেয়ার প্রতি বারবার হেনেছে বিষবাণ, কটাক্ষ আর নিন্দা। এমনও নিন্দা রটিয়েছে যে, যুবতী বিধবা মেয়েদের স্কুল খুলে রূপ-যৌবনের প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছে। সমাজের অন্ধকার দূরীকরণে নিরত রোকেয়া ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও বিনয়ের সাথে এসব সয়েছেন। শুধু

Dhaka University Institutional Repository

কখনও কখনও তাঁর ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে। কখনোবা তাঁর রচিত গ্রন্থের "মুখবন্ধে" "আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।"[৩] (অবরোধবাসিনী)।

তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি নারীসমাজও রোকেয়ার প্রথাবিরুদ্ধ চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধতা করে বলেন; "গত আশ্বিন-কার্তিকের 'নবনূরে' মি. আল-মুসাভী ও ইউসুফজী সাহেবের লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ের প্রতিবাদ করাই যে ভগিনী হোসেনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা "ভ্রাতা-ভগ্নী" প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই সহজে অনুমিত হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, উহা দ্বারা আমাদের লাভ হইবে কি?...ভগিনী হোসেনকে আমরা আমাদের মুখপাত্র বলিয়া জানি। এরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট এ-প্রকার বাহুল্য কথা শুনিতে কখনই আমরা আশা করি না।"[৪]

জনৈক বিবি ফাতেমার এ মন্তব্যে প্রকাশ, তিনি নারীমুক্তি আন্দোলনে কোনো লাভ দেখতে পান না।

রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ স্থবির সমাজ রোকেয়ার অগ্রাগামী ভূমিকার গৌরব অনুধাবন করতে পারেনি। অসাধারণ দৃঢ়তায় রোকেয়া যখন নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবীতে সোচ্চার তখন রোকেয়ার বিরুদ্ধাচারণ করে এক নারী লেখেন— "তিনি যেরূপভাবে যথেচ্ছাচারিণী রমণী মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন ও পুরুষ জাতিকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণীর পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছে।

আমি পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য গৃহে। স্বামী, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। কি করিয়া কোর্টে Plead করিব, তাহা না ভাবিয়া, কি করিয়া সন্তানগণকে প্রকৃত মানুষ করিব, কি করিয়া স্বামীর সহধর্ম্মিণী, আরামদায়িনী গৃহলক্ষ্মী হইব, তাহার চিন্তা করা উচিত।"[৫]

এ প্রসঙ্গে লেখক সাইফুল ইসলাম বলেন—

"অচল, অথর্ব, অনগ্রসর সমাজের লালনে এমন চিন্তা ও চিন্তকেই রোকেয়ার চারপাশ ছিল পরিবেষ্টিত। সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক অবস্থানের বিরুদ্ধে রোকেয়ার অবস্থান ও তাঁর প্রচেষ্টা ছিল সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে যাবতীয় বিভেদ অতিক্রম— এ অর্থে বলা যায় রোকেয়ার আন্দোলন ছিলো সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত।"[৬]

প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাতন্ত্রের নেতৃত্বে পরিচালিত পশ্চাদপদ, মুসলিম সমাজে রোকেয়ার নব আহ্বান 'নারীর সম অধিকার' দাবী হতচকিত, ক্ষিপ্ত করে তোলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে। ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করে রোকেয়া জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন নারীর আত্মমর্যাদাবোধকে। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

মানসিক দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ নারী সমাজের ব্যাপক অংশ-ই রোকেয়ার এ আহ্বান অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে পুরুষতান্ত্রিকতার পৃষ্ঠপোষকোতার্থে আক্রমণ করে বসেন রোকেয়াকেই।

সমাজের প্রতি রোকেয়ার নব আহ্বান মোটেও সরলপন্থায় গ্রহণযোগ্যতা পায়নি বিদ্বৎসমাজের নিকটও। ১৩১৫ সনের ভাদ্র সংখ্যা 'নবনূর'-এ 'মতিচূর'-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থ সমালোচনা করেছিলেন মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী নিজে।[৭] উক্ত সমালোচনায় রোকেয়াকে পাশ্চাত্যবাদী বলে অভিহিত করা হয়। সমালোচকদ্বয়ের মতে 'মতিচূরের প্রবন্ধগুলি যখন প্রথমে নবনূরে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাধ টুটিয়া গিয়াছিল। এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিত প্রশমিত হইলে গ্রন্থখানি পুনরায় পাঠ করি এবং সেই সময় মতিচূর সম্বন্ধে হৃদয়ে একটু অনুকূল ধারণা জন্মে; লেখিকার সকল কথা না হইলেও অনেক কথাই নিরেট সত্য এবং মতিচূর প্রকৃত মতিচূরই বটে। এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং রচনাভঙ্গি অতি মনোরম। কোন পুরুষ লেখকের পক্ষেও এইরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা শ্লাঘার বিষয়। লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভালো করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই।

'মতিচূর' রচয়িত্রীর একটি দোষের কথা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থ Christian Tract Society-র প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই আমাদের ধারণা। খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে পাদরী সাহেবগণ যাহা বলেন বা বলিয়াছেন, লেখিকার নিকট তাহা অভ্রান্ত সত্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহার মতে আমাদের সবই কু আর ইউরোপ, আমেরিকার সবই সু।"[৮]

নারীমুক্তি সংগ্রামী রোকেয়ার সাহিত্যিক জীবনের পাশাপাশি তাঁর জীবনের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে নারীশিক্ষা প্রসারকল্পে স্থাপিত 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল।' ১৯১১ সালের ১৪ মার্চ তারিখে কলকাতার ১৩ নং ওয়ালীউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের যাত্রারম্ভ হয়। মাত্র চার বছরের মধ্যে স্কুলটি (১৯২৫ সালের শুরুতে) পাঁচটি শ্রেণী নিয়ে উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ে এবং ১৯৩০ সালের মধ্যেই রোকেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ আত্মত্যাগের ফলে স্কুলটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৩১ সালে এ স্কুলের ছাত্রীরা প্রথমবারের মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

বর্তমানে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটি ১৭ নম্বর লর্ড সিনহা রোড-এ অবস্থিত। স্কুল স্থাপনের পর থেকেই এই স্কুলের বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র চলেছিল। স্কুল স্থাপনের আঠার বৎসর পরে সমাজের নানা বিরুদ্ধতার কথা আলোচনা করতে গিয়া রোকেয়া বলেছেন, "এই আঠার বৎসর ধরিয়া এই গরীব স্কুলকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কেবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। দেশের বড় বড় লোক—যাহাদের

Dhaka University Institutional Repository

নাম উচ্চারণ করিতে রসনা গৌরব বোধ করে, তাহারাও প্রাণপণে শত্রুতা সাধন করিয়াছেন। স্কুলের বিরুদ্ধে কতদিকে কত প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাহা একমাত্র আল্লাহ জানেন— তার কিছু কিছু এই দীনতম সেবিকাও সময় সময় শুনিতে পায়। স্কুলটা যে এত ঝঞ্ঝাবাত, এত শিলাবৃষ্টি, এত অত্যাচার সহিয়া এখনও টিকিয়া আছে, তাহাই যথেষ্ট।"[৯]

স্কুল পরিচালনায় রোকেয়াকে কতখানি ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করতে হয়েছিল তার বর্ণনা প্রসঙ্গে শামসুন নাহার মাহমুদ 'রোকেয়া জীবনী'-তে বলেন—

"যিনি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিতে দিয়াছেন, তিনি মনে করিয়াছেন–"আমি রোকেয়াকে ধন্য করিলাম।" আর যিনি নানা ছল-ছুঁতায়, স্কুল কর্তৃপক্ষের পান হইতে চুন খসিবার অপরাধে মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তিনি মনে করিয়াছেন—"বিরাট শাস্তি দিলাম রোকেয়াকে।" স্কুলে মেয়েদের ব্যায়ামচর্চা করিবার, গান-বাজনা শিখিবার বন্দোবস্ত করিলেন— সঙ্গে সঙ্গে পরদিন হইতে শুরু হইল উর্দু কাগজসমূহে স্কুলের শ্রাদ্ধ, স্কুল পরিচালিকার সাত পুরুষের শ্রাদ্ধ।"[১০]

রোকেয়া পরম সহিষ্ণুতায় সকল বিরুদ্ধ মতের মোকাবেলা করে স্বীয় আদর্শে অটল থেকে কর্তব্য পালন করে গেছেন। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, বরং সমাজের কল্যাণ-কামনায় তিনি স্কুলটি বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

রোকেয়ার মৃত্যুর অনতিকাল পরে ১৯৩৪ সালে এটির দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে।[১১]

১৯১৬ সালে বেগম রোকেয়া 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার এক অন্যতম ক্ষেত্র ছিল এই মহিলা সমিতি। অসহায় রমণীদের অর্থসাহায্য, বয়স্কা কুমারী কন্যার বিয়েতে অর্থদান, দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণে সাহায্যদান প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে আঞ্জুমান সমাজে তাঁর ভূমিকা পালন করেছে। শুধু অর্থসাহায্য নয়, মুসলমান মেয়েদের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে এই সমিতির দান অনস্বীকার্য। প্রারম্ভে এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে রোকেয়া যখন লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরতেন তখন তাঁকে সমাজের চোখে হেয় ও হাসির পাত্র হতে হয়েছিল। মুসলমান মেয়েরা ঘরের কোণ ছেড়ে সভাসমিতিতে যোগ দিবে, একথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নাই। একাকী অন্ধকার পথে চলতে গিয়ে রোকেয়া নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু লক্ষ্যে অটল রোকেয়া শত বিরুদ্ধ সমালোচনাতেও পিছপা হননি। আঞ্জুমানের বিভিন্ন কাজে নারী সমাজের অসহযোগিতা ও সমালোচনা প্রসঙ্গে শামসুন নাহার মাহমুদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রোকেয়া বলেছিলেন, "যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে, যেন নিন্দা গ্লানি, উপেক্ষা-অপমান কিছুতে তাহাকে আঘাত করিতে না পারে; মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে যেন ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্র, বিদ্যুৎ সকলেই তাহাতে প্রতিহত হইয়া

Dhaka University Institutional Repository

ফিরিয়া আসে।" আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে গিয়েও রোকেয়াকে সম্মুখীন হতে হয় বিরূপ সমালোচনা ও বিরুদ্ধ পরিবেশের। অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজের নারীদের কল্যাণ সাধনায় নিবেদিত প্রাণ, স্থির প্রতিজ্ঞ রোকেয়া সকল বিরুদ্ধ পরিবেশের মোকাবেলা করেছেন দৃঢ়তার সঙ্গে।

রোকেয়া তাঁর কর্মের সাফল্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত ছিলেন। সমাজের এ অন্ধকার দূর হয়ে সমাজ জাগবেই, সাথে সাথে নারীসমাজও শিক্ষায়, কর্মে, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে জেগে উঠবে–এ ব্যাপারে নিশ্চিত রোকেয়া জানতেন সেদিন অবশ্যই তাঁর এ কর্মের, তাঁর জীবনব্যাপী আত্মত্যাগের মূল্যায়ন হবে। সময়ের চেয়ে অগ্রগামী, দূরদর্শী রোকেয়ার এ ভবিষ্যৎ কল্পনা মিথ্যে হয়নি। রোকেয়া শিষ্য শামসুন নাহার মাহমুদের দৃষ্টিতে রোকেয়া মূল্যায়ন–

'এই একটি মাত্র কথার মধ্যে যেন আমরা এক নিমিষে তাঁর জীবনের ইতিহাস খুঁজিয়া পাই। বাস্তবিকই চিরদিন তাঁহার গাত্রচর্ম ও মস্তকের আবরণে কেবলই আঘাত পর আঘাত বর্ষিত হইয়াছিল। উদগ্র কল্যাণকাঙ্ক্ষাই তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া চিরদিন দুর্ভেদ্য বর্মের মত তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে'।[১২]

'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম'-এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আমৃত্যু রোকেয়া এর অবৈতনিক সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বদেশী ও খেলাফত আন্দোলনে এ সমিতি সামাজিক বাধার কারণে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে না পারলেও মুসলিম নারীদের মধ্যে স্বদেশী ভাবধারা জাগিয়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও চরকায় সূতা কেটে খদ্দর তৈরিতেও এর সভ্যরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

মুসলিম নারীদের উন্নতি ও অধিকার রক্ষায় রোকেয়ার নেতৃত্বে আঞ্জুমানের অবদান প্রসঙ্গে শামসুল আলম বলেন—

'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নারী জাতির সামাজিক, শিক্ষা বিষয়ক ও আইনগত প্রশ্নে মুসলমান সমাজে দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে"।[১৩]

এভাবে রোকেয়া নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবিরাম লড়াই করে গেছেন। রোকেয়ার প্রচেষ্টায় ক্রমে কিছু কিছু মুসলমান নারীর মধ্যেও সচেতনতাবোধের সৃষ্টি হয় এবং রোকেয়াকে কেন্দ্র করে একটি ক্ষুদ্র দল গড়ে ওঠে। তাঁরা বুঝতে শিখলেন–সভা সমিতি কাকে বলে। নারী সমাজের অধস্তন অবস্থান সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠেন এবং প্রতিকারের পথ খোঁজায় প্রবৃত্ত হন। তাঁরাও রোকেয়ার সঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সমাজ পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

রোকেয়ার গুণগ্রাহী ও পরামর্শক হিসেবে তৎকালীন বিশিষ্ট মহিলাদের মধ্যে ছিলেন ভূপালের বেগম সুলতান জাহান, মিসেস পি. কে. রায়, মিসেস হাকাম, মিসেস সাকিনা চৌধুরী, দুই বড়লাটের

Dhaka University Institutional Repository
পত্নী—লেডী চেমসফোর্ড ও লেডী কারমাইকেল। ১৯১৬ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর সর্বজন শ্রদ্ধেয়া সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯–১৯৪৯) একটি দীর্ঘ ব্যক্তিগত পত্রে রোকেয়া নিঃস্বার্থ সমাজসেবা ও অসাধারণ শিক্ষানুরাগের উল্লেখ করে বলেন—

"To her hindu and Mahomedan had no difference/ I respected her for her great layalty to her ideals of life and for the beautiful characteristics of Indian womanhood".[১৪]

এছাড়াও মোল্লা নিয়ন্ত্রিত তৎকালীন সমাজের প্রবল প্রতিরোধের পাশাপাশি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু মানুষের আনুকূল্যও রোকেয়া পেয়েছেন।

মুসলিম নারী সমাজকে শিক্ষিত করে তোলা ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন–

'কিন্তু পর্দার অন্তরালে কঠোর অবরোধের মধ্যে পালিতা একটি মহিলা যে মনে প্রাণে এই অনুচিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া, পর্দানশীনদের দুঃখ যথাসাধ্য আংশিকভাবেও মোচন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পর্দার আবরণের মধ্যে জ্ঞানের আলোকে জ্বালাইবার এবং সুস্থ ও শোভন জীবনের হাওয়া বহাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃত-কর্মা সমাজ সংস্কারিকা হিসেবে এবং উদারপ্রাণ মহিয়সী নারী হিসেবে তাঁহার মর্যাদা সকলের আগে। সুখের বিবাহিত জীবনের পরে বিধবা হইয়া স্বামীর নামে এই স্কুল করিয়া দিয়াছেন এবং নিজে তাপসীর মতো এই স্কুলকে কেন্দ্র করিয়া নিজ সমাজের মেয়েদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টাকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।"[১৫]

মুসলিম নারী সমাজের উন্নতিতে বেগম রোকেয়ার অবদান প্রসঙ্গে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন–

"সেকালে বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে থেকেও বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। সওগাতের প্রকাশকালে আমি সর্বপ্রথম তাঁর সাথেই যোগাযোগ করি। সওগাতে মহিলাদের রচনাকে যে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, এ কথাও তাঁকে জানাই।

সেই অন্ধকার যুগে বেগম রোকেয়া পর্দার অন্তরালে থেকেই নারীশিক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান— 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল।' মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে তিনি উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর যেরূপ আন্তরিক দরদ ও ত্যাগ স্বীকার ছিল, সমাজে সাহিত্যের প্রসার প্রচেষ্টায়ও তাঁর আন্তরিকতা কম ছিল না। তিনি প্রায়ই টেলিফোনযোগে সওগাতের বিভিন্ন লেখা সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করতেন। বিশেষ করে মেয়েদের সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সাথে সাথেই প্রতিবাদ করতেন।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

ব্যারিস্টার মি. আবদুর রসুল, মি. আবুল করীম জামাল, মি. এ. কে. ফজলুল হক, মৌলবী মুজীবর রহমান প্রমুখ উদার চেতনাসম্পন্ন মনীষীগণ রোকেয়ার মহান কর্মে বিশেষ সহায়ক ছিলেন। সমসাময়িক —The Mussalman, মহিলা, নবনূর, সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী, নবপ্রভা ইত্যাদি পত্রিকাও তাঁর মহান পরিকল্পনা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সমকালীন উপরোক্ত পত্র/পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, অভিভাষণ ইত্যাদি মুদ্রিত করে তা জনসম্মুখে উপস্থাপন করেছে এবং তাঁর প্রবর্তিত নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতি জনসমর্থন গড়ে তুলেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও বাংলার মুসলমান সমাজ ছিল শিক্ষা–সংস্কৃতির সকল বিষয়ে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় অনগ্রসর। জাতির এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে অন্ধকারে আলোর দিশারী হিসাবে আবির্ভূত হন রোকেয়া। তৎকালীন মুসলিম সমাজের অগ্রসর চিন্তার অধিকারী পুরুষ সদস্যদের কেউ কেউ নারীমুক্তির বিষয়ে আগ্রহী এবং নানা বক্তব্য রাখলেও রোকেয়ার মত এত গুরুত্বসহকারে আর কেউই বিষয়টিকে জীবেনর ব্রত হিসাবে নেননি। এখানেই রোকেয়া অনন্য। এখানেই রোকেয়ার বিশেষত্ব। সময়ের চেয়ে অগ্রগামী রোকেয়ার ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি, পরিপক্ক ও দূরদর্শিতাপূর্ণ চিন্তাশক্তি। গবেষক তাহমিনা আলমের ভাষায়—

'একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, নারীর সামাজিক সমস্যা, নারীশিক্ষা, নারী-স্বাধীনতা, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা ছিল সমকালের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী, নির্ভীক, সৃজনশীল, জোরালো এবং বিদ্রোহাত্মক। বেগম রোকেয়া অসীম সাহসিকতার সাথে নারীর প্রতি সামাজিক অত্যাচার, অবিচার ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রায় একাকী নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করে নারী আন্দোলনকে দুর্বার করে তোলেন।'[১৭]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতে ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজের নিকট রোকেয়ার নারীমুক্তি আন্দোলন গ্রহণযোগ্যতা পেতে থাকে। এই সময় থেকে সওগাত সহ বিভিন্ন সম-সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বেশ কয়েকজন মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকের পদচারণা পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম নারী সমাজের দুর্দশার জন্য মোল্লাদের অনেকাংশে দায়ী করেন। সওগাতের একজন লেখিকা ফিরোজা বেগম লেখেন, 'বাংলার মুসলিম শিক্ষার সর্বাপেক্ষা প্রতিবন্ধক মোল্লা সমাজ, শিক্ষার আলো পাইলে নারীর মধ্যে উচ্ছৃংখলতা দেখা দিবে, পতিভক্তি কমিয়া যাইবে, এই ধারণা করিতেন।'

এ সময়কালে মিসেস এম. রহমান, মিস ফজিলাতুন নেছা, আয়েশা আমেদ, আমিনা খাতুন, কাসেমা খাতুন প্রভৃতি লেখিকারা রোকেয়া আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নারীর অধিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্যসহ জোরালো দাবী উত্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পণ্ডিত রমাবাঈ (১৮৫৮-১৯২২) –রোকেয়া সমকালীন পশ্চাতপদ, কূপমণ্ডুক নারীসমাজের মধ্যে রোকেয়ার মতই আরেক ব্যতিক্রম–পণ্ডিত রমাবাঈ। তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম নারীবাদী ব্যক্তিত্ব।

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের গুণগামলের অরণ্যে পণ্ডিত রমাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অনন্ত শাস্ত্রী একজন মুক্তবুদ্ধির ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর নয় বছরের বালিকা বধূকে শিক্ষাদানের উদ্যোগ নিলে গ্রামের সনাতন সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রগহণ করে। প্রতিবাদে তিনি গ্রামের বাড়িঘর ছেড়ে বনে আশ্রয় নেন। সারাজীবন তিনি কোথাও স্থায়ী হয়ে বসবাস করেননি। তবে তিনি যখন যেখানে বাস করেছেন–সেখানেই নারীশিক্ষার পক্ষে প্রচার চালিয়েছেন। তিনি তাঁর আদর্শে কন্যাকে বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে গড়ে তোলেন। ১৮৭৭-এর দুর্ভিক্ষে রমাবাঈ পিতা অনন্ত শাস্ত্রী ও মাতা লক্ষ্মী বাঈকে হারান। একমাত্র ভাইকে নিয়ে পণ্ডিত রমাবাঈও পিতার মতো নারীশিক্ষা ও নারী উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কলকাতার সুধীসমাজ রমাবাঈকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানালে তিনি কলকাতায় এসে নারী স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাষায় স্বীয় মত তুলে ধরেন। অভিভূত সুধীসমাজ তাঁকে তৎকালীন সর্বোচ্চ সম্মান "স্বরসতী" উপাধিতে ভূষিত করে। এখানেই তাঁর একমাত্র ভাইয়ের মৃত্যু হয়। তিনি বিপিন বিহারী মেদভী নামক একজন শুদ্র আইনজীবীকে বিয়ে করেন, তাঁরা দুজনেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে চিন্তা-ভাবনা করেছেন।

স্বামীর মৃত্যুর পরে রমাবাঈ পুনায় চলে যান। সেখানে আর্য মহিলা সমাজ নামে এক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং সারাজীবন-ই নারীশিক্ষা বিস্তারে ও নারী উন্নয়নে কাজ করে যান। ১৮৮৬ সালে তিনি উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহনের জন্যে আমেরিকায় যান। ফিরে এসে বোম্বেতে কিশোরী বিধবাদের জন্য স্কুল ও হোস্টেল "সারদা সদন" চালু করেন। পরবর্তীতে তিনি এ সদন পুনায় স্থানান্তরিত করেন। সংগঠনকে স্বনির্ভর করার স্বার্থে তিনি "মুক্তিসদন ফার্ম" গড়ে তোলেন। স্কুল সংলগ্ন জমিতে সব্জি চাষ, তেলের ঘানি, গরু পালন, লন্ডি ও রন্ধনশালা গড়ে তোলেন। ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষে এখানে অনেক নারী আশ্রয় লাভ করে।

পণ্ডিত রমাবাঈ সমাজসেবার পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতারও পরিচয় দেন। তিনি ভারতীয় শ্রমিকদের দুর্দশায় বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯০৪ সালে 'রাষ্ট্রীয় সামাজিক পরিষদে'র অন্তর্ভুক্ত 'ভারত মহিলা পরিষদে'র প্রথম সভায় তিনি সভানেত্রীত্ব করেন । ১৯০৮ সালে সুরাটে, ১৯১২ সালে বোম্বাইতে ১৯২০ সালে সোলাপুরেও তিনি মহিলা পরিষদের অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করেন। ভারতের নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য ১৯২৩ সালে বোম্বাইতে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়।

তিনি "হিন্দু মহিলা সমাজ সংঘ" নামেও একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংঘে সাঁতার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ইংরেজী ভাষা শেখানো হতো।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরই প্রচেষ্টায় ডেভিজ সাগুন হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয় এবং বের্ডিং হাউসও খোলা হয়।

রোকেয়ার সমসাময়িক এই মহিয়সী নারী যিনি তাঁর সারা জীবন নারীশিক্ষা বিস্তারে, নারী উন্নয়নে ও নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা উন্নয়নে ব্যয় করেছেন– ১৯২৪ সালে পরলোকগমন করেন।

ভারতের নারী প্রগতির ইতিহাসে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মতোই সম্মুজ্জ্বল একটি নাম– পণ্ডিত রমাবাঈ।

অন্ধবিশ্বাসে আবিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জিজ্ঞাসাহীন এক অধ:প্রতিত সমাজে জন্মগ্রহণ করেও রোকেয়া প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কাছে আত্ম সমর্পণ না করে উন্নততর নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় নিজের সকলশক্তি নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রামরত ছিলেন। সংগ্রামের শুরুতে রোকেয়া যে সকল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতে ধীরে ধীরে সেগুলো অপসারিত হতে থাকে। জীবনের শেষদিকে তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক হিসাবে জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হন এবং তাঁর মহৎ কার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও অধিবেশনে সভানেত্রী হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

কূপণ্ডুক মুসলিম সমাজ যখন ধীরে ধীরে আলোর পথে অগ্রসর হচ্ছে, রোকেয়ার জীবনব্যাপী ত্যাগের বিনিময়ে জেগে উঠছে অন্ধকার কারাবন্দিনী মুসলিম নারী সমাজ, জীবনের পরম প্রার্থিত সেই সময়েই মৃত্যুবরণ করলেন সমাজকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ বেগম রোকেয়া । হঠাৎ রোকেয়া প্রয়াণে বিহ্বল ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে কলকাতাবাসী ছুটে যায় রোকেয়ার মরদেহের কাছে। তাদের প্রাণপ্রিয় নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনকে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রোকেয়াকে। দেশের নানা জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় শোকসভা। রোকেয়া কর্মের মূল্যায়নের পাশাপাশি আত্মধিক্কারও উচ্চারিত হয় সেইসব সভায় প্রদত্ত শোকবার্তায়। সর্বস্তরে স্বীকৃত হয় স্বসমাজের, স্বদেশের উন্নতিতে রোকেয়ার অবদান, আত্মত্যাগ। মৃত্যু পরবর্তী দিনে বিভিন্ন সংবাদপত্র বিশেষ সংখ্যায় শ্রদ্ধা জানায় রোকেয়াকে। বিভিন্ন জনের লেখায় উঠে আসে প্রতিকূল পরিবেশে শত বৈরিতার মাঝেও রোকেয়ার একাকী লড়াই-এর ইতিহাস। 'নারীমুক্তি' প্রশ্নে আপোষহীন রোকেয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যয় করেছেন নারী অধিকার আদায়ে, নারীকে আত্মমর্যাদায়, স্বঅধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে।

নারীমুক্তি সংগ্রামে রোকেয়ার অবদান প্রসঙ্গে রোকেয়া গবেষক তাহমিনা আলম বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

'বাঙালি মুসলিম সমাজের নারী জাগরণের ক্ষেত্রে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ভূমিকা ছিল অগ্রদূতের। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে নারী অধিকার আদায়ের জন্য যে আন্দোলন বাঙালি মুসলিম সমাজে শুরু করেন, তা তাঁর জীবনকালেই কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হয়। এবং তাঁর সেই আন্দোলনের প্রবহমানতা ও গতিশীলতা আজও আমাদের নারীমুক্তি আন্দোলনে বহমান।'[১৮]

অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পশ্চাদপদ মানসিকতার অধিকারী এক সমাজে জন্মগ্রহণ করেও রোকেয়া চিন্তা-চেতনায় যে মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, স্বশিক্ষিত রোকেয়া কোন প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ ছাড়াই 'নারীমুক্তি' প্রশ্নে যে বিপ্লবী ভাবধারায় নিজেকে দীক্ষিত করেছিলেন–সমকালীন তো বটেই, বর্তমান কালেরও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ নারী তা আত্মস্থ করতে অপারগ। 'নারী নয়'– রোকেয়ার সদম্ভ ঘোষণা; 'আমরা মানুষ।' পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টিই ছিল রোকেয়ার নারী মুক্তি আন্দোলনের স্বপ্ন, তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য।

**তথ্যসূত্র :**


১। লায়লা জামান, দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ : সংকলন ও সম্পাদনা, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৯৪, পৃ.।

২। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : আমাদের অবনতি নবনূরে (ভাদ্র ১৩১১) প্রকাশিত– সূত্র : আবুল কাশেম ফজলুল হক : 'বেগম রোকেয়া ও উত্তরকাল', আশা-আকঙ্খার সমর্থনে, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৩, পৃ. ২১০।

৩। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : রোকেয়া রচনাবলী, নিবেদন, অবরোধবাসিনী, প্রকাশকাল, ১৪ এপ্রিল, ২০০৬, মাওলা ব্রাদার্স।

৪। স. ম. সাইফুল ইসলাম : রোকেয়ার লড়াই, বিজ্ঞান চেতনা, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৩), পৃ. ৪২।

৫। মুহম্মদ শামসুল আলম : জীবনও সাহিত্যকর্ম– 'মহিলা' সূত্র, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, (ভাদ্র, ১৩১০), বাংলা একাডেমী। পৃ: -১৭৮।

৬। স. ম. সাইফুল ইসলাম : রোকেয়ার লড়াই, বিজ্ঞান চেতনা, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৩), পৃ. ৪২।

৭। মুহম্মদ শামসুল আলম – রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ– ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২০৯।

৮। ঐ পৃ. ২০২।

৯। শামসুন নাহার মাহমুদ : রোকেয়া জীবনী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০০, মং পৃ. ৪২।

১০। ঐ, পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

১১। আহমদ শরীফ– নারী মুক্তি সংগ্রামী, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বাঙলার মনীষা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০০, অনন্যা, পৃ. ১৬২।

১২। শামসুন নাহার মাহমুদ– রোকেয়া জীবনী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০০, মং, পৃ. ৫১।

১৩। মুহম্মদ শামসুল আলম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৪১।

১৪। ঐ, পৃ. ১৩৬।

১৫। লায়লা জামান– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা : মালেকা বেগম, 'সমকালীন সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে রোকেয়া ও তাঁর রচনা'– এডাব, প্রথম প্রকাশ ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ৯১।

১৬। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন– 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন', রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা, মালেকা বেগম, এডাব : প্রথম প্রকাশ– ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ৩, ৪।

১৭। তাহমিনা আলম– বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনায় ধারা প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৫৪।

১৮। ঐ, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

# উত্তরকালে রোকেয়ার প্রভাব

সবকালে সবদেশে নারীরা কমবেশী নির্যাতিত। নারীবাদ হচ্ছে পরিবার কর্মক্ষেত্র ও সমাজে নারীর হীন মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন ও এই অবস্থা পরিবর্তনে নারী ও পুরুষের সচেতন সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ। বিশ্বজুড়ে যে বিদ্যমান লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাগ পুরুষের উপর রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এসব সামাজিক পরিমণ্ডলের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং নারীকে গোটা সংসারের বোঝা বহনকারী বিনা মজুরির বাঁদিগিরির দিকে ঠেলে দেয় তাকে চ্যালেঞ্জ করে নারীবাদ। নারীবাদ হলো নারী পুরুষের সমানাধিকার অর্জনের দাবী সম্বলিত একটি সামাজিক আন্দোলন। নারীবাদ নারীর প্রথাগত ঐতিহাসিক ভূমিকা ও ইমেজের পরিবর্তন, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বিলোপ এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকার অর্জন প্রয়াসী।

১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ নারী মার্গারেট লুকাস রচিত "নারী ভাষণ (Female orations) হলো বিশ্বের জ্ঞাত ইতিহাসে প্রথম নারীবাদী সাহিত্য; যেখানে নারীর পরাধীনতা ও অসম অধিকারের বিষয়টি বিধৃত হয়েছে।

নারীবাদের ইতিহাসে প্রথম নারীবাদী রূপে যার নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন সতের শতকের ফরাসী নারী পলেইন ভি লা ব্যারো। নারীবাদকে প্রথম সংগঠিত আকারে জনসমক্ষে তুলে ধরেন ইংল্যান্ডের মেরি ওলস্টোনক্রাফট। তাঁর বিখ্যাত সাড়া জাগানো নারীবাদী গ্রন্থ "Vindication of rights of women" গ্রন্থে ১৭৯২ সালে। এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য হলো নারীরাও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ – তারা কোন ভোগের সামগ্রী বা যৌনজীব নয়, তাই তাদের স্বাধীকার দিতে হবে। সম সাময়িককালে আমেরিকার জুডিথ সারজেন্ট মুরে "লিঙ্গ বৈষম্য প্রসঙ্গে (on the inegualities of the sex) শিরোনামে কতগুলো নিবন্ধ রাচনা করে দেখান যে, নারীরা কখনই জন্মগত কারণে পুরুষের চাইতে কম দক্ষ নয়।

১৮৪০ সাল থেকে আমেরিকার দাসপ্রথা ও মদ্যপান বিলোপ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীবাদী চেতনা আরো বিকশিত হয়। এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন, লুক্রেশিয়া মটো, সুশান বি অ্যান্থনী, লুসি স্টোন, এঞ্জেলিকা ই গ্রিমকে, সারা এম গ্রিমকে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এদের মধ্যে এঞ্জেলিকা ও সারা এই দুই নিগ্রো বোন–নারী-পুরুষ সাম্যের পক্ষে প্রচারণা চালান। ১৮৯১ সালে এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন সহ আরো ২৩ জন নারী মিলিতভাবে। "Womens Bible" রচনা করেন। তাঁরা এই গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্মে বর্ণিত নারী অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করেন। এছাড়াও কেডি স্ট্যান্টন ও সুশান বি এ্যান্থনি মিলে ১৮৬৮ সালে নারীবাদী সাময়িকী "দি রেভোলিউশন" প্রকাশ করেন। এ সাময়িকীর লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

ছিল নর-নারীর সমানাধিকার প্রচার। ১৮৩৭ সালে আমেরিকায় প্রথম দাস প্রথা বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে মার্কিন নারীরা রাজনীতি করার অধিকার লাভ করে।

১৮৪৮ সালের ১৯-২০ জুলাই নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস-এ নারীবাদী উদ্যোগে বিশ্বে প্রথম নারীর অধিকার বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে "ডিক্লারেশন অব সেন্টিমেন্ট" ঘোষণাপত্র ঘোষণা করা হয়। ১৮৫৭ সালে নিউইয়র্কের সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকেরা ভোটাধিকার, উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রম ঘন্টা হ্রাস, সাপ্তাহিক ছুটি, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারসহ বিভিন্ন দাবীর প্রেক্ষিতে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে। ৮ মার্চ এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে তারা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা সহ কিছু দাবী আদায়ে সমর্থ হয়। ১৯১০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী সম্মেলনে জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব করেন। ১৯১৪ সালের সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃত দেয়ায় বর্তমানে এ দিবসটি সার্বজনীনভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পালিত হচ্ছে।

পরবর্তীকালে নারীদের দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে কতগুলো সংগঠন গড়ে ওঠে এবং এ সংগঠনগুলো নারীদের বিভিন্ন দাবী- বিবাহ-বিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ভোটাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮৮৫ সালে মেরী কার্পেন্টারের নেতৃত্বে নারীবাদী আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে। ১৯০৩ সালে এমিলিন প্যাঙ্ক থাস্টের নেতৃত্বে নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে।

ফ্রান্সেও ৩০-এর দশকে নারীবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং ১৮৪৮ সালে নিবয়েট-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'Women voice' সহ বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

লুই মিচেল এবং এলিজাবেথ ডিট্রিভ ১৮৭১ সালে ফ্রান্সে শ্রমজীবী জনতার সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন ১৮৮৯ সালের প্যারিস আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে নারী-পুরুষের সমান মজুরী এবং নারীর ভোটাধিকারের দাবী তুলে ধরেন।

নারী অধস্তনতার প্রতিবাদে ও নারী-পুরুষ সমানাধিকারের দাবীতে নারীরা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে উদার যুক্তিবাদী পুরুষেরাও সোচ্চার হয়েছেন। জন স্টুয়ার্ড মিল ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত দার্শনিক ও আইনজ্ঞ। ১৮৬৬ সালে পার্লামেন্ট সদস্য হবার পরে নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। ১৮৬৯ সালে তিনি নারী অধিকারের পক্ষে তাঁর বিখ্যাত বই 'The subjection of women' প্রকাশ করেন। ১৮২৫ সালে দার্শনিক উইলিয়াম টমসন এর "The half portion of mankind

Dhaka University Institutional Repository

women's appeal to the rest portion against male chauvinism" প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত নাট্যকার হেনরি ইবসেন-এর কালজয়ী নাটক "The Dolls House"-এর নোরা চরিত্রটি আধুনিক নারীবাদী চেতনার মূর্ত প্রকাশ।

এছাড়া মার্কস এঙ্গেলস রচিত বিশ্বখ্যাত (১৮৪৮ সালে প্রকাশিত) 'কমিউনিস্ট ইশতেহার', এঙ্গেলসের (১৮৮৪ সালে প্রকাশিত) 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উদ্ভব', অগাস্ট বেবেল-এর 'নারী : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' এবং 'নারী ও সমাজতন্ত্র' গ্রন্থসমূহ নারী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে নারী আন্দোলন গড়ে ওঠে। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে নারীবাদী ধ্যান-ধারণা বিস্তার লাভ করে। শিক্ষিত, সচেতন পুরুষ সমাজ বিশেষত রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ নারীদের বিশেষত হিন্দু নারীদের শোচনীয় দুরাবস্থা থেকে রক্ষাকল্পে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলেন। ধীরে ধীরে ভারতীয় নারীসমাজ যেমন– জ্ঞানদানন্দিনী, কৃষ্ণভাবিনী, মোক্ষদাদায়িনী প্রমুখ এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং বিভিন্ন লেখালেখি এবং সংগঠন (সখি সমিতি) গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

এ সময়ে নারীরা-'সরলা দেবী চৌধুরানী, সরোজিনী নাইডু' রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেন। '১৮৮৯ সালে মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত রমাবাঈ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নারীবাদী আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দান করেন এবং সর্বভারতীয় স্তরে প্রভাব বিস্তার করেন। বাংলায়ও তার ঢেউ এসে লাগে। ১৯১০ সালে সরলাদেবী চৌধুরানী সর্বভারতীয় নারী সংগঠন 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে বাংলায় প্রথম নারীবাদী প্রবন্ধ "স্ত্রী জাতির অবনতি" প্রকাশের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দির শুরতেই যে অমিততেজ নারীবাদী প্রতিভার উত্থান ঘটে তিনি হলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনিই প্রথম বাংলার প্রকৃত নারীবাদী রূপে খ্যাত।

লেখক, গবেষক শাহীন রহমানের মতানুসারে 'রোকেয়ার সমগ্র জীবন ও কর্ম বাংলায় আধুনিক নারীবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে।"[১] শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেও রোকেয়া কিভাবে এমন বৈশ্বিক মানের নারীবাদী চৈতন্য অর্জন করলেন তা আজো গবেষকদের কাছে বিস্ময়ের কারণ।

রোকেয়া শুধু মুসলিম সমাজ তথা ভারতীয় সমাজের নারী মুক্তি নয়, সমগ্র বিশ্বের নারী সমাজের মুক্তি দাবী করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত ইংরেজী ভাষায় দক্ষ, আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত, সমকালীন বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কৌতুহলী রোকেয়া সমকালে সংঘটিত বিভিন্ন দেশের নারী আন্দোলনসহ অতীতের নারী মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কেও ছিলেন অবহিত। রোকেয়ার পঠন-পাঠনের পরিধিও ছিল বিস্তৃত (মেরী করেলীর 'মার্ডার অফ ডেলিশিয়া'- বঙ্গানুবাদ', বিভিন্ন লেখায় সমকালের ও অতীতের বিভিন্ন দেশের কবি, লেখকের লেখার উদ্ধৃতি বা ব্যবহার লক্ষণীয়)।

যে সমাজে নারী শিক্ষার আলো থেকে দূরে, অবরোধ প্রথার শিকলে গৃহবন্দিনী, মানবিক অধিকার বঞ্চিত, সেই সময়ে, সেই সমাজে রোকেয়ার মধ্যে নারীবাদী চেতনার উন্মেষ এবং নারী সমাজকে মুক্তি সংগ্রামে আহবান জানানো বিস্ময়করই বটে।

বর্তমানে নারীবাদের যে ধারা তা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। নারীবাদের সবচেয়ে প্রাচীন ধারা হলো লিবারেল ফেমিনিজম। যার উৎপত্তি ঊনবিংশ শতকে এবং যা ষষ্ঠদশ ও বিংশ শতাব্দীতে শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবী ছিল লিবারেল ফেমিনিস্টদের মূল দাবী।

র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টদের উদ্ভব ঘটে পাশ্চাত্যে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে। এই নারীবাদীরা নারীর গৃহশ্রমভিত্তিক শোষণ ও নারী-পুরুষ সম্পর্কের উপর জোর দেয়। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা নারীর স্বাধীন, একক সত্তায় বিশ্বাসী।

মার্কসবাদী ফেমিনিস্টদের আত্মপ্রকাশ ঘটে সত্তরের দশকে। মার্কসবাদী ফেমিনিস্টরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ ও সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ এবং সমাজবাদী সমাজগঠন-ই নারীমুক্তির উপায় বলে মনে করে। মার্কসীয় নারীবাদীদের আন্দোলন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং পুরুষাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে।

বর্তমানে নারীবাদী চেতনার মূল ভিত্তি হচ্ছে নারীবাদের এই তিনটি স্তর। নারীবাদের এই তিনটি স্তর-ই রোকেয়া চেতনায় দীপ্যমান, লেখক গবেষক সুরাইয়া বেগম এ প্রসঙ্গে বলেন–

"রোকেয়া নারীর অধস্তন অবস্থাকে স্বীয় জীবন দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন এবং এর কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন এসব নারীবাদী চেতনার বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করেছিল তাই তিনি নারী-পুরুষ সম্পর্কে, নারীর মূল্যহীন শ্রম, লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন, বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অধিকার, পুরুষের সম-অধিকারের কথা বলেছেন।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের সকল ক্ষেত্রে, বলা যায় জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সকল স্তরে, নারীকে সম্পৃক্ত করা ও নারী-পুরুষের সমনাধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল রোকেয়ার কর্ম ও চিন্ত-চেতনার মূল লক্ষ্য। অর্থ্যাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ও সমাজের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের মত সমভাবে বিচরণের অধিকার দেয়া এবং সেই অধিকার ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়াই ছিল রোকেয়া জীবনের ব্রত।

সমাজে যেদিন থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা জন্ম নিয়েছে এবং শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে সেদিন থেকে নারীর উপর শোষণ নিপীড়ন শুরু হয়েছে এ কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশে নারী সর্বকালেই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অথচ সুদীর্ঘকাল ধরে নারী তার মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছে এবং দীর্ঘকাল ধরেই এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের নারী সমাজ প্রতিবাদ-সংগ্রাম করে আসছে।

আমাদের দেশের বর্তমান নারী সমাজের অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় নারী ও কন্যা শিশু ধর্ষণ, খুন, এসিড নিক্ষেপ, ফতোয়াবাজি, প্রতারণা ও লাঞ্ছনার খবর পাওয়া যায়। দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং নারী পাচার দমন আইনও আছে। কিন্তু এসব আইনের বাস্তবায়ন খুবই দুর্বল এবং প্রায় অকার্যকর। বিভিন্ন সমীক্ষা মতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৪ হাজার নারী ও শিশু বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়। তাদের বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তি, শ্রমদাসত্ব, অশ্লীল ছবি নির্মাণ, ও ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্যবহার করা হয়। এখনো প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশী কিশোরী পাকিস্তানে পতিতাবৃত্তিতে আটকে আছে; কলকাতার গণিকালয়ে ১৪% নারী বাংলাদেশী।

আমরা যখন সভ্যতা বলি তখন তা পুরুষ-সভ্যতা কিংবা নারী সভ্যতা বোঝায় না। সভ্যতা মানেই মানবসভ্যতা। অর্থাৎ নর-নারীর মিলিত সভ্যতা। কিন্তু আজ সমাজের অর্ধেক অংশ নারীকে অধিকার বঞ্চিত রেখে ভোগ্যপণ্য সাব্যস্ত করে এবং ঘরে-বাইরে সর্বত্র পুরুষ শাসনে অধীনস্ত রেখে বাস্তবে সভ্যতাকে অসম্পূর্ণ করে রাখা হয়েছে।

আইনের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের সমতার কথা উল্লেখ থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় পারিবারিক আইন বলবৎ থাকায় সমভাবে নারীর অধিকার ভোগে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি হয়। যেমন–মুসলিম বিয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষী হিসাবে নারীর ক্ষমতা পুরুষের অর্ধেক। অর্থাৎ ১ জন পুরুষ ২ জন নারীর সমান। বিয়েতে এজন্য ১ জন পুরুষ সাক্ষীর স্থলে ২ জন নারী সাক্ষী হতে হবে। এমনকি ২ জন পুরুষের বদলে ৪ জন নারী সাক্ষী হলে চলবে না। সেক্ষেত্রে ১ জন পুরুষকে অবশ্যই সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকতে হবে। অর্থাৎ একজন নারীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় না। একইভাবে বাংলাদেশের সকল ধর্মাবলম্বী নারীদের পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করলে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চনার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন-আমাদের দেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী আছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বিভিন্ন ধর্মীয় পারিবারিক আইন বিদ্যমান থাকায় মেয়েরা সম্পত্তির সমনাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন-মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বাবার সম্পত্তি মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক পায়। আর হিন্দু আইনে তো বাবার সম্পত্তিতে মেয়েদের কোন অধিকার-ই নেই। বৌদ্ধ আইন হিন্দু আইনের মতোই। একমাত্র খ্রিস্টান ধর্মের আইনে বাবার সম্পত্তিতে ছেলেমেয়ের সমান অধিকার স্বীকৃত।

বাংলাদেশে প্রচলিত নাগরিক আইন নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। ১৯৫১ সালের আইন অনুসারে পিতার নাগরিকত্ব সন্তানে বর্তায়, কিন্তু মাতার নাগরিকত্ব সন্তানে বর্তায় না। অর্থাৎ শুধু বাবার দিক থেকে নাগরিকত্ব আসে। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা আছে। সম্প্রতি আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেখার বিষয়, শেষ পর্যন্ত তা কী দাঁড়ায়। সম্প্রতি সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ অনুযায়ী ধর্ম প্রচলিত প্রথা অনুমোদিত বাল্যবিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিয়েতে বর-কনের সম্মতি, বিয়ের ন্যূনতম বয়স (ছেলে ২১, মেয়ে ১৮) এবং বিয়ে রেজিস্ট্রিকরণ প্রচলিত আইনে বাধ্যতামূলক কিন্তু গ্রামে এখনো বাল্যবিবাহ প্রচলিত। বাল্যবিবাহ বন্ধে সরকার জন্য রেজিস্ট্রিকরণের বিধান বাধ্যতামূলক করলেও স্থানীয় সরকার প্রশাসনের দুর্বল ভূমিকা এবং মানুষের সচেতনতার অভাবে এটা এখনও কার্যকর নয়। ধর্মীয় অনুশাসনে যেভাবে বিষয়টা দেখা হয় তাতে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ছাড়া আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের নারীরা নিজ ঘরের গৃহস্থালী কাজের বাইরেও অফিস-আদালত, গার্মেন্টস, শিল্প-কারখানা, কৃষিক্ষেত্র, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, নির্মাণ কাজ, কুটির শিল্প, গৃহপরিচারিকা, দিনমজুরি ইত্যাদি নানা পেশা ও কর্মে নিয়োজিত। সর্বত্রই তারা একদিকে ধনবাদী সমাজ-বৈষম্য ও অন্যদিকে পুরষশাসিত সমাজ-পীড়নের শিকার। আজকের দিনে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নারী স্বাধীনতার নামে নারীদের বাজারী-পণ্যে পরিণত করছে, পুরুষদের ভোগ-লালসার আধুনিক উপাদানে পরিণত করেছে, অন্যদিকে মৌলবাদীরা নারীদের গৃহপালিত পণ্য হিসাবে গৃহবন্দী রাখতে চাইছে।

বাংলাদেশে কারখানা শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মজীবি মায়েদের শিশুসন্তানদের জন্য কর্মস্থলে দিবাযত্ন কেন্দ্র (ডে কেয়ার সেন্টার) স্থাপন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা (বিশুদ্ধ পানীয় জল, খাবার ক্যান্টিন) প্রদান, নারী-পুরষভেদে শ্রমিকদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার দায়িত্ব মালিকের। এখানে নারী শ্রমিকেরা ন্যূনতম মানসম্পন্ন কর্ম পরিবেশ থেকেও বঞ্চিত। কর্মক্ষেত্রে হরহামেশাই তারা ধর্ষণসহ নানাবিধ যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। অধিকাংশ কারখানাতেই নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। এর

Dhaka University Institutional Repository

বাইরে মজুরি বৈষম্য তো আছেই। অন্যান্য পেশাতেও নারীরা মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হলেও নানান প্রতিকূলতার কারণে চাকুরি করতে পারে না। কারণ কর্মজীবি নারীদের জন্য হোস্টেল এবং তাদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম, নেই বললেই চলে। নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আইনগত বাধা না থাকলেও প্রয়োজনীয় আয়োজন ও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করছে। শৈশবকাল থেকেই মেয়েদের দেহমনে বেড়ে উঠার সুযোগ খুবই কম। ছেলেবেলাতেই মেয়েদের ইনডোর গেমসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের উপস্থিতি মূলত বাণিজ্যিক স্বার্থে। নাটক, সিনেমা ও বিজ্ঞাপনে নারীকে ভোগ্যপণ্য বা যৌন সামগ্রীরূপে দেখানো হয়। সমাজে নারী ও পুরুষের বিরাট বৈষম্য থাকলেও প্রত্যক্ষ নারী উন্নয়নে জাতীয় বাজেটের মাত্র ৩.১০ শতাংশ ব্যয় করা হয়।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যে বৈষম্য, পদে পদে নারীরা যে নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার, এর মূল অনেক গভীরে। পুরো বিষয়টা নির্ভর করে নারীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। আমাদের সমাজে নারীরা একদিকে সামাজিক বৈষম্য অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈষম্য আর অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার নির্যাতনের শিকার। বাংলাদেশের নারী পুরুষ ২০০ বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং ২৪ বছর পাকিস্তানী প্রায় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। সেই সংগ্রামে সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীসমাজ শুধু নির্যাতন সহ্য করেনি, পুরুষদের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সংগ্রামের এক বীরোচিত অধ্যায়ও রচনা করেছিল। ব্রিটিশবিরোধী ও পাকিস্তান বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতি পাতায় বাংলার নারীদের মহিমান্বিত আত্মত্যাগের স্বাক্ষর রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের নারী সংগঠন ও সচেতন নারীসমাজ নারীদের যে অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন প্রায় একশো বছর আগেই নারী মুক্তিকামী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীর সেই অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। পুরুষের কাছে দয়া বা অনুগ্রহ ভিক্ষা নয়, পুরুষের আধিপত্য ও দুঃশাসনের প্রতিবাদ করে অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়েছে রোকেয়ার সেই আহবানে।

বিশ শতকের ষাটের দশকে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়েই এক বিশেষ সচেতনতা সৃষ্টি হয়। বিশ্বের নারী সংগঠনগুলো নারীর প্রতি বৈষম্যের জন্য ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগের দাবীতে নানা আন্দোলন গড়ে তোলে। সংগঠনগুলোর এই সক্রিয়তার ফলে ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের নারী সংগঠনের সদস্যরাও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে বর্হিবিশ্বের নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোপেনহেগেনে। তৃতীয় নারী সম্মেলন ১৯৮৫ সালে নাইরোবীতে ও চতুর্থ নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫-তে বেইজিংয়ে।

১৯৭৫ সালে বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনের ফলে ১৯৭৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ' ঘোষণা করা হয়। এর ৪ বৎসর পর ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও। (Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) যাকে বলা হয় নারীর আন্তর্জাতিক "Bill of Rights"। এই প্রথম কোন সনদে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যকে আইনী ও প্রকৃত বাস্তবে বিলোপ করার ঘোষণা দেয়া হয়। লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি বা বয়স নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে অধিকার যে একটি মৌলিক মূল্যবোধ-সিডও সনদ এ প্রেক্ষিতে নারীর অধিকারকে ব্যাখ্যা করেছে।

বাংলাদেশের মহিলা সংগঠনগুলো, যথা– মহিলা পরিষদ, মহিলা সমিতি, মহিলা সংস্থা প্রভৃতি এই সিডও সনদে অন্তর্ভুক্ত নারীর সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার ও সম-সুযোগের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অধিকার ও সুযোগ আদায়ের জন্য নানামুখী আন্দোলন, আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই সকল ক্রিয়াকলাপের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে সিডও দলিলের তিনটি ধারার চারটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে (ধারা ২, ১৩.১ (ক), ১৬.১ (গ) ও (চ) অসম্মতি জানিয়ে এই সনদে অনুস্বাক্ষর করে। ধারা ২ হলো : বৈষম্য বিলোপের লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথ নীতি ও পদ্ধতি। ধারা ১৩.১ (ক) পারিবারিক কল্যাণের অধিকার। ধারা ১৬.১ (গ) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, আর (চ) অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কত্ব ও পালক-সন্তান গ্রহণ অথবা জাতীয় আইনে যেখানে অনুরূপ ধরনের ধারণা বিরাজমান রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও দায়িত্ব –সকল ক্ষেত্রে সন্তানের স্বার্থই হবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকার উক্ত চারটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে অসম্মতি জানিয়ে অনুস্বাক্ষর করায় এ দেশের নারীর জন্য সমান অধিকার ও সমান সুযোগ প্রাপ্তির প্রত্যাশা সুদূরপরাহত হয়ে পড়ে। এই কারণে নারী সংগঠনগুলো আন্দোলনের মাধ্যমে এই অসম্মতি প্রত্যাহারের দাবিতে আবারও অধিকতর সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই নারী আন্দোলনের ফলে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ১৩.১ (ক), ও ১৬.১ (চ) ধারার অসম্মতি প্রত্যাহার করে। বর্তমানে ধারা ২ এবং ১৬.১ (গ) [বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার ও দায়িত্ব] সম্পর্কে বাংলাদেশের অসম্মতি বহাল আছে।[৩]

নারী সংগঠনগুলোর আন্দোলন ও দাবির কারণে ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ (আন্তর্জাতিক নারী দিবস) তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" ঘোষিত হয়। এই নীতির মূল লক্ষ্য হলো "যুগ যুগ ধরে

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতিত ও অবহেলিত এ দেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা।" ১৯৯৭ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে ধারা ১৮-এর উপধারা ২-এ সুস্পষ্টভাবে নারী ও পুরুষের সমঅধিকারে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে [রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরের নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন]। উপরন্তু, সম্পদের উত্তরাধিকারিত্বেও যে নারীর পুরুষের সমান অধিকার আছে সে বিষয়টিও ধারা ৭-এ উপধারা ৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তীতে ২০০৪ সালের যে মাসে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতিটিকে পরিবর্তিত করে নতুন একটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' ঘোষণা করে। এই পরিবর্তিত নারী নীতিতে নারীর সমঅধিকার, সম্পদ ও সম্পত্তিতে সমান অংশীদারিত্ব এবং নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিষয়গুলো অপসারণ করা হয়। দেশের নারী সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানায় এবং প্রতিবাদ, আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের নারী সংগঠনগুলো পুনরায় 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' থেকে বৈষম্যমূলক ধারাগুলো বাতিলের দাবী জানায়। বাংলাদেশের নারী সমাজের দাবীর মুখে ২০০৮ সালের ৮ মার্চ প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ তৃতীয় 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' ঘোষণা করেন। ২০০৮ সালে নারী নীতিটি ঘোষণার সাথে সাথেই বাংলাদেশের উগ্র মৌলবাদী মহল নানারকম জঙ্গী আন্দোলনের মাধ্যমে এ নীতিটি বাতিলের দাবী জানায়। তাদের দাবীর মুখে সরকার পুনঃ বিবেচনার জন্য নীতিটির বাস্তবায়ন স্থগিত করে।

'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' ২০০৮ স্থগিতের ঘটনায় দেশের নারী সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং নারী সংগঠনগুলো ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'র মূল লক্ষ্য হলো : জীবনের সকল ক্ষেত্রে বলা যায় জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সকল স্তরে, নারীকে সম্পৃক্ত করা ও নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ও সমাজের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের মত সমভাবে বিচরণের অধিকার দেয়া এবং সেই অধিকার ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া। বাংলার সর্বপ্রথম নারীবাদীদের একজন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রায় একশো বছর আগেই এই দাবীগুলি অর্থাৎ নারীর জন্য পুরুষের সমান অধিকার ও সমসুযোগের দাবী জানিয়েছেন। রোকেয়ার নারী অধিকার দাবী প্রসঙ্গে রোকেয়া উত্তর গবেষক হাছনা বেগম বলেন—

'নারী শিক্ষা, নারীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের বিষয়গুলো রোকেয়া রচনার মূল বক্তব্য হিসেবে লক্ষ্যণীয়'।[৪]

নারী অধিকার আদায়ে রোকেয়ার অবদান প্রসঙ্গে গবেষক তাহমিনা আলমের মূল্যায়ন—

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজে তিনিই ছিলেন মুক্তবুদ্ধিআন্দোলনের প্রবর্তক। উদ্যম, ত্যাগ, কঠোর কর্মনিষ্ঠা, মুক্তবুদ্ধি, চিন্তাশীলতা ও সৃজনশীলতার বলে তিনি তাঁর জীবন ও সমকালের পারিপার্শ্বিকতার অনেক উর্দ্ধে উঠে এবং সমগ্র বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা দূরে সরিয়ে বাঙালি মুসলিম নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করতে সমর্থ হন। আর তাই বেগম রোকেয়া বাঙালি মুসলিম সমাজের ইতিহাসে এক যুগ পরিবর্তনকারী মহীয়সী মানবরূপে চির অম্লান ও অমর হয়ে আছেন'।[৫]

মানবজাতির অর্ধঅংশ নারীসমাজকে অন্ধকার অবরোধে, নির্বোধ মানবেতর জীবন বহন না করে জ্ঞানের আলোকে সচেতন এবং আপন বুদ্ধিতে বলিয়ান হয়ে স্বাধীন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হতে আহ্বান জানিয়েছেন রোকেয়া। সেই আহ্বানকে 'পুতুল' জীবনে অভ্যস্ত নারীসমাজের অন্ধকার মনের আবদ্ধ কুঠরিতে প্রবেশ করবার সাধনায় তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন। তাঁর চিন্তা-চেতনার সমস্তটা জুড়েই ছিল একটি উদ্দেশ্য; শুধুমাত্র আচ্ছন্ন বুদ্ধি নিয়ে পুরষের হাতের পুতুল হয়ে বাঁচার মধ্যে নারী-জীবনের যে অর্থহীনতা আর অসারতা সে সত্যটি সম্বন্ধে সমাজের প্রত্যেককে সচেতন করা। পুতুলের জীবনের অসারতা বোঝাতে তিনি পরম ধার্মিক রাম ও পতিপ্রাণা সীতার সম্পর্ককে একটি বালক আর পুতুলের সম্পর্কের সাথে তুলনা করেছেন। অথচ সাধারণ্যের কাছে রামসীতার দাম্পত্য সম্পর্ক হচ্ছে আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্কের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন রোকেয়া এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'পুতুলের সঙ্গে বালকের যে-সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে ভালবাসিতে পারে, পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি খড়গহস্ত হইতে পারে, হারানো পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহলাদে আটখানা হইতে পারে;–কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না। হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ।" এই পুত্তলিবৎ অচেতন পদার্থ নারীসমাজকে জ্ঞানের অমৃতপানে স্বাধিকার সচেতন হয়ে উঠতে হবে আর এই জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উপায় হল কুসংস্কার ও গোঁড়ামী থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করা। রোকেয়ার দৃঢ় অভিমত "নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হলে তবেই মানব-জাতির মুক্তি।"

সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীদের সম অধিকারের কথা বাংলায় সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন একজন অবরোধবন্দিনী নারী রোকেয়া। রোকেয়া তাঁর লেখা, মেয়েদের স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা এবং নারী সংস্থা গঠনের মাধ্যমে জায়া ও জননী – নারীর এই প্রথাগত ভূমিকাকেই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তাঁর আগের ও পরের সংস্কারকেরা তাঁদের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণে সংস্কারাবদ্ধতার জন্যে নারীর এই প্রথাগত ভূমিকা বদলের কোন চেষ্টাই করেননি বরং তাঁরা সামান্য কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে রোকেয়া বিবাহ ও গেরস্থালীর বাইরে মেয়েদের

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থানের কথা বলেছিলেন। নারীর জীবন সম্পর্কে রোকেয়ার ধারণা ক্রমে বাংলার মুসলিমদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে এবং নারীর চিরাচরিত ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করা শুর হয়। কোন পূর্বসূরীর পথ-নির্দেশ ছাড়াই রোকেয়া তাঁর ধ্যান-ধারণাকে মাত্র দুই দশকের মধ্যে পূর্ণরূপে বিকশিত করেছিলেন। তাঁর কর্মময় জীবনও ব্যাপিত ছিল এই দুই দশক ধরে।

যে সময়ে রোকেয়া কলকাতায় এসে সংস্কার কর্মসূচী শুরু করেছিলেন, সে সময় বাংলার মেয়েদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার ভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। '১৯১৩ সালে সব ধর্মের মেয়েদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম তৈরী করার উদ্দেশ্যে সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে বাংলায় একটি "Female Education Committee" গঠন করা হয়েছিল। এরফলে মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলেও স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্যটি ঐতিহ্যিক ধারণার আবর্তেই বাঁধা পড়েছিল।

১৮৯৭ সালে কলকাতায় মুর্শিদাবাদের নবাব ফেরদৌস মহল স্থাপন করেন একটি মুসলিম মেয়েদের স্কুল, এরপরে ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয় 'সোহরাওয়ার্দি গার্লস স্কুল।' এর দুবছর পরে ১৯১১ সালে রোকেয়া তৈরী করলেন, "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল।" ১৯১১ সালের পরপরই মেয়েদের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলি স্কুল চালু হয়। ১৯১৩–১৪ সালের শিক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সোহরাওয়ার্দী গার্লস স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে বিশেষ অনুদান পেত। ১৯১৬ সালে আরো চারটি মুসলিম মেয়েদের স্কুল সরকারী অনুদান পেত। সেগুলি হল মদনপুর মোসলেম গার্লস স্কুল, আসানসোল হানিফা মোসলেম গার্লস স্কুল, কুমিল্লার ইসলামিয়া গার্লস স্কুল এবং রংপুরের মুন্সীপাড়া স্কুল। এ ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে জেনানা স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিডল স্কুল, হাইস্কুল, কারিগরী ও শিল্প শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন করে মুসলিম মেয়েদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল।[৬]

১৯১১ সালে রোকেয়া যখন কোলকাতায় "সাখাওয়াত মেমেরিয়াল স্কুল" খোলেন তখন পর্যন্ত কোলকাতায় মেয়েদের জন্য বেথুন কলেজিয়েট স্কুল (শুধুমাত্র উচ্চ বর্ণের হিন্দু এবং ব্রাহ্ম ছাত্রীদের জন্য) ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল এবং ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল সহ সাতটি উচ্চ বিদ্যালয়, ছয়টি এমই স্কুল, পাঁচটি ভার্নাকুলার স্কুল, একচল্লিশটি উচ্চ প্রাথমিক এবং একচল্লিশটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিলো। মুসলমান মেয়েদের জন্যে নিম্ন মাধ্যমিক উর্দু স্কুল ছিলো ১৪টি আর ২৫টি কোরান স্কুল অর্থাৎ মক্তব। কিন্তু একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিলো না।[৭]

"সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" ছিল এসব স্কুল থেকে ব্যতিক্রম। কারণ এই স্কুল স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মেয়েদের আধুনিক করারও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল। আর এই স্কুলের ছাত্রীরাই পরে বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম নারীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পক্ষে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে।

'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' রোকেয়া গঠিত প্রথম মুসলিম নারী সংগঠন। এর সদস্যরাই অর্থাৎ রোকেয়ার যোগ্য উত্তরসূরীরাই পরে বাংলায় নারী মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে। আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল এই সংগঠন-এরই দু' একটি উজ্জ্বল নাম।

তৎকালীন মুসলমান সমাজে 'আঞ্জুমানে'র অবদান সম্পর্কে শামসুন নাহার মাহমুদের উক্তিটি স্মতর্ব্য–

"কলিকাতার মুসলমান নারী সমাজের গত বিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রাখিয়াছে।"[৮]

রোকেয়া সমকালীন বা রোকেয়া উত্তর প্রজন্মের উপরে রোকেয়ার প্রভাবের বিষয়ে গবেষক শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক বলেন—

'রোকেয়াকে আমরা দেখতে পাই একটি যুগের সূচনা হিসেবে' সব সময় প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবেও এক একটা মানুষের হাতে এক একটা সময় গড়ে ওঠে। রোকেয়ার লেখার ভাষা এবং বিষয়, দুইই ছিল সময়ের তুলনায় আশ্চর্য রকমের নতুন। এবং সেই লেখা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান গৃহের অভ্যন্তরে এবং বাইরেও দারুন আলোড়নের সৃষ্টি হয়ে যায়। জানানা মাহ্ফিলে সংকলিত প্রায় প্রত্যেক লেখিকার (জানানা মাহ্ফিল– বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা ১৯০৪–১৯০৮, সম্পাদনা–শাহিন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক) লেখায় এবং তাঁদের পরিচিতিতে এবং সাক্ষাৎকার পর্বে রোকেয়ার প্রভাবের বিস্তারটি ধরা পড়েছে'।[৯]

অন্ধকার নিমজ্জিত এক সমাজে জন্মগ্রহণ করেও কি করে রোকেয়া মনন এমন মুক্তবুদ্ধির, যুক্তিবাদী ও আলোর প্রত্যাশী হয়ে উঠলো তা নিয়ে বিস্তর ভাবনা-চিন্তা হয়েছে। ইয়াসমিন হোসেন (প্রেক্ষাপট–জানানা মাহ্ফিল) লিখেছেন উনিশ শতকের হিন্দু সমাজের সংস্কার আন্দোলনের কথা, কোথাও কোথাও লেখা হয়েছে তাঁর বড় বোন, বড় ভাই এবং স্বামীর অবদানের কথা। তিনি কী ধরনের বই পড়তেন তার একটা ছবি গোলাম মুরশিদ তাঁর রচনায় দিয়েছেন (রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া–নারী প্রগতির একশো বছর–) "সমকালীন পত্র-পত্রিকা তিনি যে পড়তেন, তাঁর বিভিন্ন রচনায় তার উল্লেখ আছে। প্রধান প্রধান ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকের নাম ছাড়াও, John Howard Paryne, Ellen Hoopoer প্রমুখ অপ্রধান কবি-সাহিত্যিকের উল্লেখ এবং উদ্ধৃতি আছে তাঁর রচনায়। সেকালের খ্যাতনামা বাঙালি কবি-সাহিত্যিকেরও উল্লেখ করেছেন তিনি। এমনকি, কামিনী সেন, মানকুমারী বসুও বাদ যাননি। কিন্তু যা বিশেষ করে দৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

আকর্ষণ করে, তা হলো : সমকালীন ইংরেজী আর উর্দু পত্র-পত্রিকার নাম। মেরি করেলি (১৮৫৫-১৯২৪) ছিলেন সেকালের বেস্ট সেলার। পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহকে তিনি ভাষা দিয়েছিলেন। মেরি করেলির সঙ্গে রোকেয়ার বক্তব্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। ...। পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং ভাবধারা থেকে নারীমুক্তির আদর্শ তিনি স্বীকরণ করেছিলেন, এমন অনুমান বোধহয় অসঙ্গত নয়। রোকেয়া স্বগঠিত এবং স্বশিক্ষিত মানুষ। এর পেছনে ছিলো ব্যাপক অধ্যয়ন, সযত্ন পরিশীলন, আর পরিবেশের যৎকিঞ্চিত আনুকূল্য"। রোকেয়ার লেখায় কেউ মেরি Wollstonecraft-এর ছায়াও দেখতে পেয়েছেন।[১০]

বিংশ শতাব্দীর সূচনায়, যখন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আবির্ভাব ঘটে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে, ততদিনে বাঙালি হিন্দু এবং ব্রাহ্ম মহিলারা সাহিত্যসৃষ্টি আর সমাজভাবনায় অনুধাবনযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ফেলেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে। রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী, কৃষ্ণভাবিনী দাসের ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা এবং অন্যান্য প্রবন্ধও পাঠক ও চিন্তাশীল সমাজে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। অন্তঃপুর, পরিচারিকা, তত্ত্ববোধিনী, বামাবোধিনী ইত্যাদি পত্রিকায় মেয়েদের লেখা এবং নারী-বিষয়ক লেখা নিয়মতিভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সর্বভারতীয় স্তরে মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত রমাবাই তখন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন এবং বাংলায়ও তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলার মুসলিম সমাজেও শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে নারীশিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দিয়েছে এবং সমাজেও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল।

এমনি এক যুগ-পরিবেশেই রোকেয়া তাঁর স্বপ্নকে (শিক্ষিত, স্বাবলম্বী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন স্বাধীন নারী সৃষ্টি) বাস্তবে পরিণত করার কঠিন সংগ্রামে নেমেছিলেন এবং সে লক্ষ্যে একই সঙ্গে স্কুল পরিচালনা, নারী সংগঠন পরিচালনা এবং লেখনী চালনা করেছেন।

রোকেয়ার যে কর্মসূচি তৈরী করে নিয়েছিলেন তার মাধ্যমে তিনি জায়া ও জননী, নারীর এই প্রথাগত ভূমিকাকেই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু নারী অধিকার সচেতন রামমোহন বিদ্যাসাগর বা আধুনিকা জ্ঞানদানন্দিনী কৃষ্ণভাবিনী কেউই নারীর ঐতিহ্যিক ভূমিকা বদলের কোন চেষ্টাই করেননি। তাঁরা বরং সামান্য কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নত 'শিক্ষিত স্ত্রী এবং শিক্ষিত ও সচেতন মা' নারীর এই ভূমিকাকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে রোকেয়া দৃঢ়কণ্ঠে বিবাহ ও গেরস্থালীর বাইরে মেয়েদের কর্মসংস্থানের কথা বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে গবেষক ইয়াসমিন হোসেন বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলায় প্রথমদিকের সংস্কারকরা যেমন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশব চন্দ্র সেন পুরুষদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মেয়েদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রাথমিক সংস্কার শুরু করেছিলেন এবং তা মূলত হিন্দু সমাজের মহিলাদের জন্য হলেও সেই কার্যক্রম রোকেয়ার আবির্ভাবের জন্য একটি সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরি করেছিল'।[১১]

বাংলায় নারী অধিকার সচেতনতা প্রসঙ্গে লেখক আনোয়ারা আলমের মন্তব্য —

'উনিশ শতকের শেষার্ধের আগে ইতিহাসের কোন পর্বেই বাঙালি নারী কার্যত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পুরুষ প্রধান তথা লিঙ্গভিত্তিক সমাজে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল নারীর জন্য। নিষেধের এই প্রাচীর তুলে দিয়েছিল শাস্ত্র, ধর্ম, লোকাচার। বৈদিক যুগে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বশীল দুটি সংস্থা 'সভা' ও 'সমিতি'তে নারীর অংশগ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ। ইসলাম ধর্মেও পর্দা প্রথার কারণে নারীর পক্ষে রাজনীতি চর্চার আদৌ অবকাশ ছিল না। এরপরেও বিভিন্ন সময়ে যে সকল নারী শাসন ক্ষেত্রে ক্ষমতার শীর্ষে এসেছিলেন তা সম্ভব হয়েছিলো নিতান্তই পুরুষ কর্তৃত্বের করুণায়, অনুমোদন সাপেক্ষে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে। বাংলায় নারী জাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ। তাঁদের সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের মাধ্যমে সূচিত হয় নারী জাগরণের আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় বাঙালি নারী নতুন জীবন চর্চা, সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে কমবেশি সজাগ হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পর বাঙালি নারীর রাজনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক অনুপ্রবেশ ঘটে। কংগ্রেসের ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম সর্বভারতীয় অধিবেশনে দুজন বাঙালি নারী স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করেন।'[১২]

বাংলার ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' বাংলার নারী সমাজকে দ্রুত রাজনীতিমুখী করে তোলে। এ আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য এগিয়ে আসেন নারী সাহিত্যিকেরাও। এদের অন্যতম স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রমীলা দাশ, নির্ঝারিণী বসু প্রমুখ। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ না নিলেও রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে নারী সমাজকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানান। বাংলার নারী অধিকার আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব কবি সুফিয়া কামাল। রোকেয়ার যোগ্য উত্তরসুরী, রোকেয়ার ভাবশিষ্য সুফিয়া কামাল (জন্ম ১৯১১– মৃত্যু ১৯৯৯)। সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও ভাষা আন্দোলনসহ বাঙালির ন্যায্য অধিকার আদায়ের যে কোন সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক নারী ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নিজেদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দান করেন। দেশের ১৯৬৯ সালের উত্তাল গণ অভ্যুত্থানের সময়ে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে "মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীতে এই সংগঠনই "পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ" নামে পরিচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর নাম হয় "বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ"। অদ্যাবধি এই সংগঠন নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে।

মুক্তিযুদ্ধে বেগম সুফিয়া কামাল ও 'মহিলা পরিষদে'র অবদান প্রসঙ্গে গবেষক মালেকা বেগম বলেন —

'১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধেও বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে 'মহিলা পরিষদ' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত (৭ মার্চ ১৯৭১) একটি খবর, "গতকাল (শনিবার) ঢাকা শহরের মা-বোনেরা গণআন্দোলনের সহিত সংহতি ঘোষণা করিয়া সভা ও মিছিল করেন। 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ এই সভা ও মিছিলের আয়োজন করে। বিকাল ৩টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে 'মহিলা পরিষদে'র সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাধীকার আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। ...। এক প্রস্তাবে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য সকল গণতান্ত্রিক দল, ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।...স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়'।"[১৩]

পরবর্তীকালেও এই সংগঠন দেশের বিভিন্ন সংকটপূর্ণ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এখনও দেশের নারী আন্দোলনে, নারীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নারী সংগঠনের ইতিহাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিলো, চল্লিশের দশকে তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত "মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।" এই সমিতি একটি গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগঠন হিসেবে গঠিত হয়েছিল। মণিকুন্তলা সেন, গীতা মুখ্যার্জী রেণু চক্রবর্তীসহ এই সংগঠনের বেশ কয়েকজন বিভিন্ন প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। [১৪]

বাংলার নারী আন্দোলনে রোকেয়া শিষ্য সুফিয়া কামালের অবদান সম্পর্কে 'জানানা মাহফিল'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য স্মরণীয়– 'রোকেয়ার ভাবশিষ্য ও অনুসারী বেগম সুফিয়া কামাল ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক বেগম-এর সম্পাদক পদে বৃত হন এবং নারী অধিকার আন্দোলনসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পঞ্চাশের দশকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লায় আয়োজিত বিভিন্ন সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক প্রয়াসে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি, ভাষা-আন্দোলন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁর অগ্রণী অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে গৃহগণ্ডিতে কর্মরত অজস্র নারীকে। তাঁর তারাবাগের গৃহ হয়ে ওঠে পঞ্চাশের দশকের ঢাকার এক প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।'[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

"তুই তো ফুলকবি, তা ফুলকবি হয়েও সমাজের কাজ করতে হবে"–রোকেয়া সাখাওয়াতের এই আদেশ কিংবা আশীর্বাদ শিরোধার্য করেই কবি সুফিয়া কামাল সারা জীবন পথ চলেছেন।

"পাকিস্তানের শুরুতেই মাতৃভাষার উপর আঘাত এলো। রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অবশ্য শায়েস্তাবাদের আমাদের পরিবারের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু আমাদের রক্ত-অস্থি-মজ্জায় যে ভাষা মিশে গেছে তা বাংলা।"[১৬] সুফিয়া কামালের এই উক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয় রোকেয়ার ক্ষেদোক্তি", 'বাঙলার মুসলমানেরা মাতৃহীন।'

বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা প্রশ্নে দোদুল্যমানতা বা উর্দুর প্রতি পক্ষপাতিত্বে ক্ষুব্ধ রোকেয়া (পিতা ও স্বামীর পারিবারিক ভাষা উর্দু হওয়া সত্ত্বেও) বাঙলার পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়ে উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত সুফিয়া কামাল বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে বাঙলার পক্ষে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত "একুশের সঙ্কলন : গ্রন্থপঞ্জি" বইয়ে একুশ নিয়ে তাঁর ৬৫টি কবিতার উল্লেখ আছে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে পাকিস্তানী সামরিক সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করলে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে সরকারী বাধা নিষেধ ভেঙ্গে ঢাকা ও বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়।

'মুসলিম পারিবারিক আইন "১৯৬১" প্রণয়নের পর মৌলবাদীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও সুফিয়া কামাল ও শামসুননাহার মাহমুদ দৃঢ় প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ৭১ এর পুরোটা সময় ঢাকায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসায় বসে বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধে সুফিয়া কামালের ভূমিকা ছিল কিংবদন্তীতুল্য।

স্বাধীন বাংলাদেশেও সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। নারী নির্যাতনের প্রতিটি বিষয়ে সুফিয়া কামাল ছিলেন একট সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ।

শামসুননাহার মাহমুদ (জন্ম ১৯০৮ – মৃত্যু ১৯৬৪) ছিলেন রোকেয়ার মানসকন্যা। অবরোধবন্দিনী শামসুননাহার বাড়িতে লেখাপড়া করেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপরে তাঁর বিয়ে হয় হৃদয়বান ডাক্তার ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে সেই সময়ের আরো অনেক নারীর মতো এই বিয়ে শামসুননাহারের জীবনের বন্দীত্ব ঘুচিয়ে তাঁর জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলে দেয়।

রোকেয়ার ক্রমাগত উৎসাহ ও তাগিদে শামসুননাহার মাহমুদ বি.এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে রোকেয়া শামসুন্নাহারের বি.এ. পাশ করা উপলক্ষে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলে' এক

Dhaka University Institutional Repository

সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন রোকেয়ার আহ্বানে সেই সভায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলারা সমবেত হয়েছিলেন। আনন্দোজ্বল রোকেয়া সেদিন বলেছিলেন, "আমার সেই বত্রিশ বৎসর পূর্বের মতিচূরে কল্পিত লেডী ম্যাজিস্ট্রেট লেডী ব্যারিস্টারে স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে–আমার এ আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায়? অনেকেই আরাদ্ধ কাজের সমাপ্তি নিজের জীবনে দেখিতে পান না। যে বাদশাহ কুতুব মিনার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমার মিনারের সাফল্য আজ আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম'।

রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" দিয়ে শামসুননাহারের কর্মজীবনের শুরু। এরপর রোকেয়া প্রদর্শিত পথেই সারাজীবন চলেছেন তিনি। রেখেছেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ নারী অধিকার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান। ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কর্মী ছিলেন তিনি। ১৯০৩ সালে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে বাংলার প্রধান অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন তিনি। ১৯৪২ সালে পাস করেন এম. এ.। ১৯৩৩ সালে হাবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুননাহার দুই ভাইবোনের যুগ্ম সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকা 'বুলবুল।' 'অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স', 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া', 'বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন লীগ', 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অফ উইমেন' ইত্যাদি নারী প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী।[১৭]

দেশভাগের পর ঢাকায় এসে তিনি যোগ দিলেন সরকারী নারী সংগঠন A.P.W.A (All Pakistan Women's Association) -তে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গড়ায় নারীদের কর্মপ্রচেষ্টা যুক্ত করাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর মূলমন্ত্র। "মুসলিম পারিবারিক আইন–১৯৬১"– প্রণয়নে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণীর। ঢাকায় বেগম ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর আমৃত্যু তিনি তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

বাংলার নারী আন্দোলনে রোকেয়ার অবদান প্রসঙ্গে গবেষক শামসুল আলমের মূল্যায়ন——

'বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলনে প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছেন রোকেয়া। ১৯৪০ সালে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি "আমাদের অবনতি" লিখে পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের বঞ্চনা ও নিপীড়ন–বিষয়ে সুদৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নতুন চিন্তা, কৌতুহল, অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিপ্রিয়তা প্রভৃতির মাধ্যমে মানব-কল্যাণ সাধনের বাণী প্রচার করেছেন তিনি। বলা যায়, নবজাগরণের একটা বিশেষ ধারায় মুসলমান সমাজে নারীর লাঞ্ছনা মোচনে, তাঁদের ধর্মানুমোদিত অধিকার প্রতিষ্ঠায়, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার সাধনে তাঁর সকল প্রয়াস নিবেদিত হয়েছিল। রোকেয়ার মধ্যে কর্মপ্রয়াস ও ভাবলোকের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল'[১৮]–

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সাধনায়, নারী সমাজের উন্নতি প্রচেষ্টায় তথা সমাজের উন্নতিকল্পেও মাতৃভাষা বাংলার গৌরব প্রতিষ্ঠার অব্যাহত প্রচেষ্টায় রোকেয়া জীবন উৎসর্গ করেন।

রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল"-এ রোকেয়ার হাতে গড়া, তাঁরি ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্রীরাই পরবর্তীতে বাঙালি মুসলমান সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা প্রসারে, নারী অধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন।

শামসুননাহার মাহমুদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে রোকেয়া উত্তর বাংলার নারী সমাজে রোকেয়ার প্রভাবের বিষয়টি–

"এই যে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলমান মেয়েরা 'চলি চলি পা পা' করে মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছেন–এর গোড়ার কথা খুঁজতে গেলে কি বলতে হয়? বলতে হয়–এর জন্য বেশ অনেকখানি দায়ী মিসেস হোসেনের সাধনা – তাঁর দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সংগ্রাম। মেয়েদের জন্য তিনি করেছিলেন স্কুল। আর মেয়েদের মায়ের জন্য করেছিলেন এক নারী সমিতি। তাঁদের অনেকরেই তিনি এই সমিতির ভিতর দিয়ে তিন তিল করে প্রেরণা যুগিয়েছেন। দিনের পর দিন চেষ্টা করে ঘরে ঘরে গিয়ে তাঁদের মুখের ঘোমটা খসিয়েছেন, হাত ধরে ধরে তাঁদের ঘরের বার করেছেন। আর যাঁরা সাক্ষাৎভাবে তাঁর পরিচিত নন–প্রত্যক্ষে যাঁরা তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পাননি, তাঁরাও প্রত্যেকে তাঁর কাছে ঋণী। একথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বাংলার প্রত্যেকটি মুসলমান মেয়ে তাঁর দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েছে। প্রত্যেকেরই তিনি ছিলেন friend, philosopher and guide।'[১৯]

ভাষা প্রসঙ্গে বাংলার প্রতি রোকেয়ার নি:সংশয় সমর্থনের দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় মেলে শিষ্য শামসুননাহারের ভাষায়–

"আজ বাংলার মুসলমান বাংলাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করতে শিখেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন তারা হোসেন শাহ, নসরত শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতির কথা ভুলে গিয়েছিল, বাঙালি বলে পরিচয় দিতে তারা লজ্জাবোধ করতে, বাংলা ভাষার কথা বলতে তারা ঘৃণা বোধ করতো।

তাঁর জীবনের বেশির ভাগ কেটেছিল ভাগলপুর ও কলকাতার উর্দুভাষী সমাজে...। তা সত্ত্বেও কেমন করে যে তিনি আজীবন মনেপ্রাণে বাঙালি ছিলেন একথা ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়। বাংলার মাটিতে তাঁর জন্ম–বাংলার বায়ু, বাংলার জলে তিনি মানুষ, একথা ভোলেননি তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও। বাংলার প্রতি ধুলিকণার সঙ্গেই ছিল তাঁর নাড়ির যোগ...। তিনি ছিলেন Bengali first Bengali next and Bengali always,"[২০]

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে, ৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে ছাত্রী/শিক্ষক সহ নারীদের দৃপ্ত প্রতিবাদী পদচারণা মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে রোকেয়ার সাহসী ভূমিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মতিচূর (প্রথম খণ্ড) 'মুক্তিফলে' তিনি দেখিয়েছেন–মেয়েদের সহায়তা না পেলে একা পুরুষের প্রচেষ্টায় দেশ জননীর পরাধীনতা মোচন বা স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ রোকেয়ার আকাঙ্ক্ষারই বাস্তব প্রতিফলন। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে ৪৭-এ ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিতারণ, ৭১-এ বর্বর পাকিস্তানী শক্তির পরাজয়।

দেশ গড়ার কাজেও যে নারী পুরুষের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' উপন্যাসে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তুলে ধরেছেন রোকেয়া। রোকেয়ার ভাষায় "নর-নারী উভয়েই একই সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ পুরুষ শরীর, রমণী মন'। রোকেয়া সমকালীন সমাজ বাস্তবতায় রোকেয়ার এই চেতনা অবিশ্বাস্য অথচ রোকেয়ার মধ্যে নববোধের এই উজ্জীবন আমরা দেখতে পাই।

নারী অধিকার সচেতন রোকেয়াকে গবেষক সুরাইয়া বেগমের মূল্যায়ন—–

'রোকেয়ার চিন্তা-ভাবনা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকার যে বিধি বিদ্যমান তার বিপরীতধর্মী চিত্রকে আমাদের সামনে উত্থাপিত করেছেন। নারী শুধু গৃহাভ্যন্তরে অন্তরীণ থেকে গৃহস্থালী কাজ করবে অর্থাৎ রান্না, শিশুপালন, পরিবারের সদস্যদের সেবাযত্ন ইত্যাদি এবং পুরুষ বাইরের জগতে বিচরণ করবে। দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে–একে তিনি স্বীকার করে নিতে পারেন নি। কাজের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনকে মেনে না নিয়ে এভাবে কাজকে আরোপ করে দেবার ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নারী যদি পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষালাভ করে তাহলে তারাও পুরুষের তুলনায় উন্নত বই অবনত হবে না। বরং নারীরা সৃষ্টিশীল ভূমিকা অনেক উন্নত পুরুষের তুলনায়। সমাজের এই লিঙ্গভিত্তিক কর্ম বিভাজনকে মেনে না নেবার সুন্দর উদাহরণ; সুলতানার স্বপ্ন। যেখানে নারী রাজ্যশাসন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত এবং পুরুষ অন্ত:পুরবাসী, গৃহকর্মে নিযুক্ত।'[২১] অবশ্য রোকেয়ার নারীস্থানে পুরুষ শুধু গৃহস্থালী কাজই করে না, বিভিন্ন কলকারখানাতেও তারা নিযুক্ত। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সমাজের উন্নতিতে নারীপুরুষের সমান অংশগ্রহণ।

সমাজে নারী ও পুরুষের কোন পার্থক্যকে রোকেয়া স্বীকার করেননি। স্বীকার করেন নি পুরুষের তুলনায় নারীর শারীরিক দুর্বলতা বা বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতাকে। তিনি বলেন, "আমাদের উন্নতির ভার বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব'।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম পারিবারিক আইনে নারীর যে অবনত অবস্থান তাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন তিনি। কৌশলগত কারণে ধর্মকে তিনি এক্ষেত্রে সরাসরি আক্রমণ করেন নি কিন্তু পরোক্ষ আক্রমণ ছিল অর্থাৎ নারী নির্যাতনের প্রধান দিকগুলোকে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। নারীবাদী সচেতনতার কারণেই এটা হয়েছে। তিনি বলেন–"মুসলমানের চোখে আমরা পুরুষের অর্ধেক, অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা আড়াইজন হই। আপনারা 'মোহাম্মদীয়' আইনে দেখিতে পাইবেন যে, বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। এছাড়াও দেখা যায় যে, মুসলিম বিয়েতে দুইজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন। দুইজন না থাকলে একজন পুরুষের পরিবর্তে দুইজন নারীর সাক্ষ্য প্রয়োজন আবার দুইজন পুরষের পরিবর্তে চারজন নারী সাক্ষীতে বিয়ে সম্পাদিত হতে পারবে না।" ধর্মীয় আইনে নারীর পূর্ণাঙ্গতার যে অবমাননা সে ব্যাপারে রোকেয়া অনেক আগেই আমাদের সচেতন করে গেছেন।

রোকেয়া উত্তর প্রজন্ম সুরাইয়া বেগম রোকেয়াকে স্বীকৃতি দেন এভাবেই—

'আজকের নারীবাদী চিন্তায় যে বিষয়গুলো আন্দোলিত হচ্ছে–যেমন, নারী-পুরুষ সম্পর্কে সমতা, পারিবারিক আইনের নারীবিরোধী দিক, গৃহকর্মের অর্থনৈতিক মজুরী, পুরুষের তুলনায় নারীর কম মজুরী তথা পুঁজিবাদী শোষণ এসব বিষয়ে তিনি বক্তব্য রেখেছেন প্রায় আশি বছর আগে। রোকেয়ার মৌলিকত্ব এখানেই। তিনি পথ দেখিয়েছেন, সে পথ ধরে আমরা চলছি'।[২২]

বেগম রোকেয়াকে এই উপমহাদেশের নারীবাদী চেতনার অগ্রদূত হিসেবে অভিহিত করা হয়। আজ যে নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতার কথা বলা হয়, আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে আমাদেরই সমাজে, আমাদের মতোই একজন বাঙালি নারীর মানসে এর অঙ্কুরোদগম হয়েছিল।

নারীর রাজনৈতিক অধিকার সচেতন রোকেয়া নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে তৎকালীন নারী অধিকার সচেতন নারীদের সঙ্গে শুধু ক্যাম্পেইন-ই করেননি, এ দাবিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আলোচনা সভাতেও 'আঞ্জুমানে'র পক্ষ থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন। বর্তমানে রোকেয়ার উত্তরসূরী এ প্রজন্মের নারীরা শুধু ভোটাধিকার প্রয়োগ-ই করছে না, ভোটে জয়ী হয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে শাসন ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে আসীন হয়ে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণও রাখছে।

বাঙালি নারীর এ ভোটাধিকার প্রাপ্তি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সহ তৎকালীন নারী সমাজের আন্দোলনেরই ফল।

নারীশক্তিতে বিশ্বাসী রোকেয়ার কাঙ্খিত রাষ্ট্রের নাম "নারীস্থান"। পুঁজিবাদী, পুরুষতান্ত্রিক, বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত এক রাষ্ট্র এই "নারীস্থান"।

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়ার স্বপ্নরাষ্ট্রের সকল বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় নারীদের দ্বারা, আর শারিরীক শ্রমজনিত কাজগুলো করে পুরুষেরা। রোকেয়ার নারীস্থান শান্তির আলয়, এখানে নেই কোন অভাব, নেই যুদ্ধবিগ্রহ, রেষারেষি পরনিন্দা-পরচর্চা। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। কেউ অযথা দলাদলি করে সময় নষ্ট করে না। এখানে স্বাস্থ্য রক্ষার সুব্যবস্থা আছে। (বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে নারীস্থানে), আছে নারী শিক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা (যেখানে নারীরা তাদের পছন্দমত বিষয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে)। পুরুষদের জন্য আছে 'মর্দানা'। সেখানে তারা অবরোধের মধ্যে বাস করে, সন্তান লালন-পালনসহ গৃহস্থালী কর্ম সম্পাদন করে। নারীস্থানের বাসিন্দাদের ধর্ম হলো–"প্রেম ও সত্য।"

নারীস্থানে বিজ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহার লক্ষণীয়। নারী স্থানের নারী বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের সাহায্যে সৌরশক্তি ব্যবহার করে রান্না, 'জলধর বেলুনে'র সাহায্যে মেঘ সৃষ্টি করে বৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। ১৯০৫ সালেই বেগম রোকেয়া সৌরশক্তি সংগ্রহ করা এবং কৃত্রিম মেঘ তৈরি করা যে সম্ভব সেকথা কল্পনা করেছিলেন, যা রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্কতা ও অগ্রগামী মানসিকতার প্রমাণ।

নারীস্থানের নারী পরিচালকেরা নারী-পুরুষ উভয়ের শক্তিকে কাজে লাগিয়েই সে দেশকে একটি উন্নত আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পেরেছেন।

রোকেয়ার মতে ভারতবর্ষে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের কর্মক্ষমতাকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যবহার না করার ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে এ দেশ একটি অনগ্রসর, পশ্চাদপদ দেশ হিসেবে রয়ে গেছে।

বেগম রোকেয়ার নারী ভাবনার আরেকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর 'পদ্মবাগ' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের নায়িকা সিদ্ধিকা ওরফে জয়নবের-বক্তব্য থেকে রোকেয়ার নারীবাদী মতবাদের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সিদ্দিকার প্রতিটি বক্তব্য মুক্তবুদ্ধি এবং স্বাধীন চিন্তা-চেতনার পরিচায়ক। সিদ্দিকার বক্তব্য মূলত রোকেয়ার নিজেরি উক্তি। নারী পুরুষের সমানাধিকারের ব্যাপারে সুস্পষ্ট তাঁর দাবী।

ব্যারিষ্টার লতিফ আলমাসের বিবাহিতা স্ত্রী জয়নব স্বামীর সংসারে প্রবেশের আগেই ঘটনাচক্রে সমাজ-সংসার বিচ্ছিন্ন হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে 'তারিণীভবনে'। অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, সুশিক্ষিত, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, স্বীয় অধিকার সচেতন সিদ্দিকা পরবর্তীতে লতিফ আলমাসকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও শত অনুরোধেও (লতিফ আলমাসসহ দীনতারিণী দেবী ও অন্যদের) আর লতিফ আলমাসের সংসারে ফিরে যেতে রাজী হয়নি। সিদ্দিকা আত্মপ্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করে, "আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম সার্থকতা নহে; সংসার ধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।[২৩]

নতুন যুগের চিন্তা-চেতনার অধিকারী সিদ্দিকা সুশিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী হয়েছে। সে তারিণীভবনের কার্য্যালয় হতে প্রতিমাসে ২০০/- টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়। নারী মুক্তির জন্যে

© Dhaka University Institutional Repository

যে শিক্ষার সাথে সাথে অর্থনৈতিক মুক্তিও প্রয়োজন এ উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকার মাধ্যমে রোকেয়া সে কথাই বলতে চেয়েছেন। নারী সমাজের উন্নতিকল্পে "পদ্মরাগ" উপন্যাসের নায়িকা 'সিদ্দিকা' চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে রোকেয়া স্বাধীন, স্বাবলম্বী, আত্মপ্রত্যয়ী যে নারীর ছবি কল্পনা করেছিলেন– বর্তমান কালের নারীরা রোকেয়ার সেই প্রত্যাশারই স্বপ্নপূরণ।

বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলো তাদের নারীবাদীয় আদর্শ গঠনে বেগম রোকেয়ার ধ্যান-ধারণার দ্বারাই প্রভাবিত। সংগঠনগুলোর দাবীর রূপরেখাও প্রণীত হয় মূলত বেগম রোকেয়ার নারী-ভাবনার মৌলিক অবস্থান থেকেই। নারী সংগঠনগুলোর ও সচেতন নারী সমাজের দাবীর মুখে নারীদের উন্নতিকে বাস্তবে রূপ দেবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রগতিশীল দুইটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করে– জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮। এই দুইটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে নারীর অধিকার ও সুযোগের প্রশ্নে একই অবস্থান নেয়া হলেও পার্থক্য শুধু সম্পদের উত্তরাধিকারিত্বের সম-অধিকারের বিষয়ে। ২০০৮-এর নীতিতে সম্পদের উত্তরাধিকারিত্বে সমঅধিকার বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয় নি। সমগ্র বিশ্বপটে নারীসমাজের অধিকার ও সমসুযোগের দাবীতে জোরালো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ দ্বারা ১৯৭৯ সালে ঘোষিত "নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ" (সিডও)-কে এই দুইটি নারী নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

লেখক হাছনা বেগম বর্তমান নারী বিষয়ক নীতি নির্ধারণে রোকেয়ার প্রভাবের বিষয়টি পর্যালোচনা করেন এভাবেই—

"বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ২০০৮ সালের নারী নীতিটি পর্যালোচনা করে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই নীতিতে রোকেয়ার নারীভাবনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ, কর্মক্ষেত্র, রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রেই যে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়াটা ন্যায়সঙ্গত, এবং সরকারকে যে নারীর প্রাপ্য সকল অধিকার বাস্তবায়নের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে, এই সকল বিষয়ই এই নারী উন্নয়ন নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারীকে যে শুধু অধিকার দিলেই হবে না, সেই অধিকারকে আয়ত্ব করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগও দিতে হবে, এই নীতিতে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। উপযুক্ত সুযোগ পেলে শিক্ষিত হয়ে নারীরাও যে রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে, এই বাস্তব সম্ভাবনাটিকে রোকেয়া তাঁর "সুলতানার স্বপ্ন" রচনার মাধ্যমে সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ২০০৮ এর নারীনীতিরও লক্ষ হলো যুযোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের দ্বারা নারী-সমাজকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ডের সাথে পুরুষের সমমর্যাদায় সম্পৃক্ত করা।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়া বাঙালি নারীসমাজকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং মুক্ত নারীসমাজের কর্মকাণ্ডের কাল্পনিক উৎকর্ষের বিবরণ দিয়ে আমাদেরকে মানবমুক্তির কল্পে নারীমুক্তির জন্য সংগ্রাম করার প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমরা যেটুকু স্বাধীনতা ও অধিকার এবং সেই অধিকার আদায়ের সুযোগ ইতোমধ্যে অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি সেজন্য কৃতিত্বের অনেকটাই তাঁর প্রাপ্য।"[২৪]

'বেগম' সম্পাদক নূরজাহান বেগমের কথায় জানা যায় ৪৭-এ দেশবিভাগের পরে ঢাকায় একটি "সাখাওয়াত গ্রুপ" গড়ে ওঠার কথা এবং এদেশের নারী অধিকার আন্দোলনে রোকেয়ার শিষ্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বদানের মাধ্যমে রোকেয়ার চিন্তা-চেতনাকে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার কথা। সময়ের চেয়ে অগ্রগামী চিন্তা-চেতনার অধিকারী রোকেয়া সমকালে কিছুসংখ্যক সমমনা মুক্তবুদ্ধির অধিকারী কর্তৃক মূল্যায়িত হলেও বৃহত্তর সমাজ বা সমাজের মূল স্রোতধারার কাছে অবমূল্যায়িত-ই হয়েছেন অধিক মাত্রায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে রোকেয়া শুধু মূল্যায়িত নন রোকেয়া মূল্যায়নে যোগ হয়ে চলেছে নতুন নতুন ভাবনা।

রোকেয়া জন্মশতবর্ষে (১৯৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর) রোকেয়া স্মরণে নারী সংগঠনসহ বিভিন্ন সংস্থা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রকাশিত হয় রোকেয়া স্মারক ডাকটিকিট। দৈনিক সংবাদ, Daily Observer সহ বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করে রোকেয়া 'স্মারণী' রোকেয়া জন্মভূমি রংপুরের পায়রাবন্দে, যেখানে সমকালে সমাজ বহির্ভূত বলে নিন্দিত ছিলেন রোকেয়া, আজ মহাসমারোহে পালিত হয় রোকেয়া জন্মোৎসব। আয়োজন হয় তিনদিন ব্যাপী রোকেয়া মেলার। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ আয়োজন করা হয় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত, চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার।

পায়রাবন্দবাসীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নারীশিক্ষা প্রসারকল্পে রোকেয়া জন্মভিটায় "পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া বালিকা বিদ্যালয়" এবং "পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া স্মৃতি ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়।"

সম্প্রতি রংপুরে 'রোকেয়া বিশ্ববিদ্যাল'–এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

রোকেয়া আজ পায়রাবন্দবাসীর গর্ব। রোকেয়ার জন্মস্থান বলেই আজ পায়রাবন্দ বিশ্বের বাংলাভাষীদের কাছে পরিচিত।

পায়রাবন্দে রাষ্ট্রীয়ভাবে তৈরী করা হয়েছে "রোকেয়া স্মৃতি কমপ্লেক্স"। যার উদ্দেশ্য ছিল 'রোকেয়া স্মৃতি রক্ষা'। পশ্চাপদ পায়রাবন্দের নারীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা, বাংলা একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের উন্নতমানের লাইব্রেরীর মাধ্যমে অনগ্রসর পায়রাবন্দবাসীর কাছে দেশ-বিদেশের জ্ঞানের আলো পৌছে দেয়া। গবেষণার মাধ্যমে রোকেয়া জীবনের অনালোকিত

Dhaka University Institutional Repository

দিকসমূহ তুলে আনা। কিন্তু বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ৯, ১০ ও ১১-এর রোকেয়া মেলার পরবর্তী ১২-তাং "নিজেরা করি" সংগঠনটি পায়রাবন্দ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের নারীদের নিয়ে আয়োজন করে "রোকেয়া স্মরণ" অনুষ্ঠানের। এ অনুষ্ঠানে শিক্ষক, আইনজীবী, নারীনেত্রী সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীরা উপস্থিত হাজার পাঁচ/ছয় নারী শ্রোতার সামনে রোকেয়া জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে নারীমুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। গ্রামের সাধারণ নারীসমাজ গভীর আগ্রহে জানতে চায় রোকেয়া জীবনের নানা দিক– শপথ নেয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার গ্রামীণ জীবন থেকে বেরিয়ে আলোয় আসার এবং কন্যাশিশুর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপের, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের।

সময়ের সাথে বেগম রোকেয়ার বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার প্রভাব আজ নারীবাদী সংগঠন, শিক্ষিত নারীদের স্তর ছাড়িয়ে সাধারণ নারীদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রোকেয়ার প্রাসঙ্গিকতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানের নারী সংগঠনগুলো নারী অধিকার আদায়ের দাবী জানাতে তাদের পোস্টারে রোকেয়ার র‍্যাডিকাল লেখার অংশবিশেষ ব্যবহার করছে।

সময়ের চেয়ে অগ্রগামী রোকেয়া মৃত্যুরও প্রায় শতবর্ষ পেরিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে চলেছেন– নতুন নতুন অনালোকিত দিকে এবং পালন করে চলেছেন– বর্তমান কালেরও নারী আন্দোলনের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা।

**তথ্য সূত্র :**


১। শাহীন রহমান– নারীবাদ : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, উন্নয়ন পদক্ষেপ, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১২, ১৯৯৮, পৃ: ৩৩–৩৯।

২। সুরাইয়া বেগম : বেগম রোকেয়ার নারীবাদী চেতনা– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারক গ্রন্থ : সম্পাদনা– মালেকা বেগম, এডাব প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ : ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ.–৭৪

৩। হাসনা বেগম : জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং বেগম রোকেয়ার নারী ও ধর্মভাবনা, নতুন দিগন্ত, সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল জুন ২০০৯। পৃ.– ৩৭

৪। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৫। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম–তাহমিনা আলম, প্রথম প্রকাশ – ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ–১৯৯৬, বাংলা একডেমী, পৃ.–১৪ (উপক্রমণিকা)।

৬। ঐ পৃ:–১৬।

৭। গোলাম মুরশিদ– রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর– প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃ:–১৩৭।

৮। শামসুন নাহার মাহমুদ– রোকেয়া জীবনী– মু: মো:, মে.-বি.এ. ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, নভেম্বর,

৯। জানানা মাহ্ফিল–সম্পাদনা শাহিন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রস্তাবনা– পৃ:–২৭।

১০। ঐ পৃ:–১৩।

১১। ইয়াসমিন হোসেন : প্রেক্ষাপট–জানানা মাহ্ফিল–সম্পাদনা শাহিন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রস্তাবনা– পৃ:–২৭।

১২। আনোয়ারা আলম– ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের নারী–শৈলী প্রকাশন, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ.–২৬।

১৩। মালেকা বেগম– একাত্তরে নারী– প্রথম প্রকাশ – জানুয়ারি ২০০১, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, পৃ. ৩৪।

১৪। বদরুদ্দীন উমর– বাঙলাদেশ নারী আন্দোলন প্রসঙ্গে–নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর : সম্পাদিত প্রথম প্রকাশিত অক্টোবর ২০০৩, শ্রাবণ পৃ.– ১৩৯।

১৫। সম্পাদকীয়– জানানা মাহ্ফিল–সম্পাদনা শাহিন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রস্তাবনা– পৃ:–২৭।

১৬। শামসুননাহার মাহমুদ – রোকেয়া জীবনী – মো. ম. ম. রি. এ; পৃ.– ৬৫।

১৭। শামসুননাহার মাহমুদ : জীবনীকার ও নারী আন্দোলন নেত্রী, জানানা মহফিল, সম্পাদনা শাহিন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, পৃ.– ২০৭।

১৮। শামসুল আলম–রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: জীবন ও সাহিত্যকর্ম–মুহম্মদ প্রথম প্রকাশ–১৯৮৯, বাংলা একাডেমী পৃ.–১৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। শামসুননাহার মাহমুদ : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, – রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারক গ্রন্থ, এডাব, সম্পাদক মালেকা বেগম, পৃ.–১৮ প্রকাশকাল – ৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

২০। ঐ, পৃ.–১৮।

২১। সুরাইয়া বেগম : বেগম রোকেয়ার নারীবাদী চেতনা– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারক গ্রন্থ : সম্পাদনা– মালেকা বেগম, এডাব প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ : ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ.–৭৩।

২২। ঐ, পৃ.– ৬৯।

২৩। পদ্মরাগ, রোকেয়া রচনাবলী – মাওলা ব্রাদার্স, ১৪ এপ্রিল ২০০৬।

২৪। হাসনা বেগম : জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং বেগম রোকেয়ার নারী ও ধর্মভাবনা, নতুন দিগন্ত, সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল জুন ২০০৯। পৃ.– ৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

# উপসংহার

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালির জাতীয় জীবনে যুগ-সন্ধিক্ষণ হিসেবে উপস্থিত। পুরাতন সংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকার অনন্ত প্রয়াস আর নবীন ভাবপ্রবাহে অবগাহন–এ দুয়ের দ্বন্দ্বমুখরতায় এ শতক বাঙালির ইতিহাসে সংকটকাল বলে অভিহিত। এ শতাব্দীতে বাংলায় একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ঘটে, যা বাংলার রেনেসাঁ নামে অভিহিত। সামাজিক সংস্কার, ধর্ম, শিক্ষা, নারীর ভূমিকা, সামাজিক রীতিনীতি (সতীত্ব, পর্দা ও অবরোধ প্রথা) সাহিত্য দর্শন এবং শিল্প জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মূলত শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আবির্ভাব নবজাগরণের শেষপাদে ১৮৮০ সালে।

যদিও মুসলিম সম্প্রদায় আত্মাভিমানবশত যুগের দাবীকে অস্বীকার করে পরিবর্তনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল তথাপি সময়ের সাথে সাথে এবং নবাব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখ শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবীর প্রচেষ্টায় এ শতকের শেষদিকে মুসলিম সম্প্রদায়েও কিছু কিছু পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে।

এই নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ও পাশ্চত্যশিক্ষা গ্রহণ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে যুযোপযোগী ভূমিকা পালনে উদ্যোগী করে তোলেন। তবে তাঁদের এই প্রচেষ্টা মূলত পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম নারী সমাজ ছিলো তখনো অন্তপুরে অবরোধবন্দিনী। ছিল অশিক্ষা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, তালাক প্রভৃতি নানা সমস্যায় নিষ্পেষিত। অধিকার বঞ্চিত, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম নারী সমাজ ছিল মুক্ত আলো বাতাস বঞ্চিত 'অবলা জীব'।

পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মুসলিম শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সচেতনতা তৈরি হতে থাকে এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এসময় (১৮৩৪-৮৫) মওলানা ওবায়দুল্লাহ ও বদীর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত দুটি সমিতি সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৮৯৭ সালে কলকাতায় একটি "মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা" স্থাপিত হয়। ১৮২২ সালের দিকে কোলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে একজন মুসলমান মহিলা কর্তৃক স্কুল স্থাপনের সংবাদ জানা যায়। অবশ্য এ সময় হিন্দু ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকদূর এগিয়ে গেছে। কেউ কেউ চাকুরীতেও প্রবেশ করেছে।

মুসলিম সম্প্রদায়ের এমনি এক দ্বিধাপূর্ণ সময়েই অন্ধকারে আলোর দিশারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন মানবতাবাদী বেগম রোকেয়া। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক এবং নারী জাগরণের অগ্রদূত। মুক্তবুদ্ধির এবং প্রখর চিন্তাশক্তির অধিকারী রোকেয়া ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। সময়ের দাবিকে বুঝতে সক্ষম গভীর জ্ঞানের অধিকারী রোকেয়া ছিলেন দক্ষ সমাজ বিশ্লেষক আর তাই সময়ের

Dhaka University Institutional Repository

দাবিকে মেনে অবরোধবন্দিনী জীবন কাটিয়ে, হাজারো বিড়ম্বনা সয়েও পরবর্তী প্রজন্মের চলার পথ করেছেন কুসুমাস্তীর্ণ এবং অভীষ্ট লক্ষ্য 'নারীমুক্তি' সাধনে একলব্যের প্রতিজ্ঞায় হয়েছেন সফল।

কালের পরিক্রমায় সকল সফলতা, সীমাবদ্ধতাসহ রোকেয়া আজ ইতিহাস।

একজন মানবতাবাদী সমাজসংস্কারক, মননশীল সাহিত্যসাধক এবং নারীমুক্তির অগ্রদূতরূপে রোকেয়া বাঙালি সমাজে হয়ে থাকবেন চিরঃস্মরণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

# সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য : প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯।

শাহজাহান মনির : বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা : বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩।

শামসুন নাহার মাহমুদ : রোকেয়া জীবনী : মুনশী মোঃ মেহেরুল্লাহ, রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ২০০০।

মালেকা বেগম সম্পাদিত : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারক গ্রন্থ : এডাব, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩।

আগস্ট রেবেল : নারী অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত (অনুবাদ কনক মুখোপাধ্যায়) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ডিসেম্বর ২০০৩।

আনু মুহাম্মদ : নারী পুরুষ ও সমাজ : সন্দেশ, ২০০৫ ফেব্রুয়ারি, শাহীন আখতার মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদিত) : জানানা মাহ্‌ফিল, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮।

মাহমুদ শামসুল হক : বাঙালি নারী : পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের নারী, বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২।

আহমদ শরীফ : বাঙলার মনীষা : অনন্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ : ব্র্যাক, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪– তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম সংস্করণ–১৯৫১

হুমায়ুন আজাদ : নারী : আগামী প্রকাশনা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

রংপুর জেলার ইতিহাস : প্রকাশনায়, জেলা প্রশাসন, রংপুর, জুন ২০০০।

মুহম্মদ শামসুল আলম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য কর্ম : বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৯।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, বেগম রোকেয়া : অবসর, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৬।

সোনিয়া নিশাত আমিন, বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন : বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ২০০২।

বদরুদ্দীন উমর (সম্পাদিত) নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে : শ্রাবণ, অক্টোবর ২০০৩।

মাজেদা সাবের : রোকেয়ার উত্তরসূরি : আর ডি আর এস বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৮।

শামীমা ইসলাম : রোকেয়া : অর্জনের ইতিহাস নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯১।

লায়লা জামান : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বাংলা একাডেমী, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭।

মফিদুল হক : নারীমুক্তির পথিকৃৎ; দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

মোতাহার হোসেন সুফী : বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য, শ্রাবণ এপ্রিল ২০০১।

মোরশেদ শফিউল হাসান : বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা এপ্রিল ১৯৮২।

রোকেয়া রচনাবলী : মাওলা ব্রাদার্স, ১৪ এপ্রিল ২০০৬।

তাহমিনা আলম : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯২।

সুতপা ভট্টাচার্য : রোকেয়া : প্যাপিরাস, কলকাতা, মে ২০০২।

আবুল কাসেম ফজলুল হক : আশা– আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে : বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩।

মালেকা বেগম : নারী মুক্তি আন্দোলন : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

আবুল কাসেম ফজলুল হক : উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য, আহমদ পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৮৮।

গোলাম কিবরিয়া ভুইয়া : বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল ১৯৯৫।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ : বুদ্ধিব মুক্তি ও রেঁনেসা আন্দোলন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৮।

মুনতাসির মামুন : উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ কাল–১৯৬৩।

আবুল কাসেম ফজলুল হক : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও উত্তরকাল, জাগৃতি, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

শাহীন আখতার : সতী ও স্বতন্ত্ররা, (১ম ও ২য় খণ্ড), ২য় সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৭।

গোলাম মুরশীদ : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩।

দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ : লায়লা জামান –সম্পাদিত। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা : ২ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

ভীস্মদেব চৌধুরী : বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য: নবযুগ প্রকাশনী, জুন ২০০৪।

শাহজাহান মনির : বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা : রোকেয়া কবির : বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান : নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৮।

নূরুর রহমান খান : সৈয়দ মুজতবা আলী : জীবনকথা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, মে ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ নাসিরউদ্দিন : বাংলা সাহিত্যে সওগত যুগ : সওগত প্রকাশনী,

অন্নদা শংকর রায় : বাংলার রেনেসাঁস, ডি.এম লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩৮১।

অমলেন্দু দে : বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ; রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৮১।

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ, চতুর্থ সংস্করণ, ডিএম লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩৬১।

অনোয়ারা বাহার চৌধুরী : শামসুন নাহার মাহমুদ: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।

এবাদত হোসেন : ডাক্তার লুৎফর রহমান : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০।

বেগম আকতার কামাল : মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।

কাজী আবদুল মান্নান : 'আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', প্রথম খণ্ড, বাঙলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

আহমদ ছফা : বাঙালি মুসলমানের মন; বাংলা একাডেমী, ১৯৮১।

এস, আব্দুর রহমান : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমধারাঙ্গনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৮৭।

ছবি রায় : বাংলার নারী আন্দোলন : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, কলিকাতা।

মজির উদ্দিন : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা; দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৭

সিদ্দিকা মাহমুদা : এম. ফাতেমা খানম; বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পাদিত) : রোকেয়া চিন্তার উত্তরাধিকার, রোদেলা, প্রথম প্রকাশ ২০০৮

আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পাদিত) : রোকেয়া, যুক্তিবাদ, নবজাগরণ ও শিক্ষা-সমাজতত্ত্ব, রোদেলা প্রথম প্রকাশ-২০০৮

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়– বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত– ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড।

A.F. Salahuddin Ahmed : Social Ideas and Social Change in Bengal (1818-1835) LeidenF.J. Brill, (1965).

Rafiuddin Ahmed : The Bengal Muslims (1871-1906): A Quest for Identity Delhi : Oxford University Press (1981).

Sufiq Ahmed : Muslim community in Bengal 1884-1912 (Dacca, Oxford University Press, 1974).

Latifa Akanda : Social History of Muslim Bengal (Dacca; Islamic Foundation, 1981).

Dhaka University Institutional Repository

Pratima Asthana ; Women's Movement in India, (Delhi : Vikas Publishing House. PVT. LTD. 1974).

Meredith Borthwick : The changing Role of Women in Bengal 1849-1905, (Princeton: Princton University Press, 1984).

HASINA JOARDER, SAFIUDDIN JOARDER : BEGUM ROKEYA : THE ENIANCIPATOR-NARI KALYAN SANGSTHA, 1980.

## সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মুরশিদ, "অন্ধজনে দেহ আলো : রঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষার সূচনা এবং শিক্ষার প্রতি ভদ্রমহিলাদের মনোভাব, ১৮৪৯-১৯০৫। 'ভাষা-সাহিত্যপত্র' : অষ্টম সংখ্যা, ১৩৮৭,

শাহানারা হোসেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণ : বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৪শ বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ: ২১।

মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম : রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন, প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, সমাজ নিরীক্ষণ, ৬২, নভেম্বর ১৯৯৬, ১-৪।

মনিরা হোসেন : 'বেগম রোকেয়া ও শার্লোৎ ব্রন্তে: নৈকট্য ও দুরত্ব, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ১৭, ১, ১৯৯৯, ২৫-৩৮।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা : সম্পাদক নূরুর রহমান খান, সংখ্যা ৬৫, ১৯৯৯।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা : সম্পাদক আনিসুজ্জামান, সংখ্যা ৩৮, ১৯৯০।

চন্দ্রাবতী : সম্পাদক-সুস্মিতা চক্রবর্তী, প্রথম সংখ্যা ২০০৯।

সাহিত্যিকী : সম্পাদক - ডঃ মোঃ মজিরউদ্দীন, এপ্রিল ১৯৯০, বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রা.বি.।

উন্নয়ন পদক্ষেপ : সম্পাদক রঞ্জন কর্মকার, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট, ১২, ১৯৯৮।

সাহিত্য পত্রিকা : সম্পাদক মো. আবু জাফর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ১, শ্রাবণ-কার্তিক ১৪১২।

মানুষ : সম্পদাক সেলিম রেজা নিউটন, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, সমাবেশ, ঢাকা।

যুক্তি : সম্পাদক অনন্ত বিজয় দাশ, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি ২০১০।

বিজ্ঞানচেতনা : অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩।

নতুন দিগন্ত : সম্পদাক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৯।

সওগাত: সম্পাদক নাসিরউদ্দিন

বেগম : সম্পাদক নূরজাহান বেগম :

সমাজ নিরীক্ষণ :

এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা :

*Dhaka University Institutional Repository*

# সাক্ষাত্কার গ্রহণ

| নাম | পদবী | তারিখ |
|---|---|---|
| নূরজাহান বেগম | সম্পাদক, বেগম | ১০/০৩/২০০৯ইং |
| মোতাহার হোসেন মুন্সী | লেখক, গবেষক | ২৮/০৪/২০০৯ইং |
| মাজেদা সাবের | লেখক, গবেষক<br>রোকেয়া পরিবারের সদস্য<br>(খলিল সাবেরের নাতনী) | ৩০/০৫/২০০৯ইং |
| শামীমা ইসলাম | লেখক, গবেষক | ০২/০৪/২০০৯ইং |
| মালেকা আশরাফ | সমাজসেবক, রংপুর | ৭/০৩/২০০৯ইং |
| রোমেনা চৌধুরী | কবি, সমাজসেবক<br>প্রাক্তন সম্পাদক,<br>মহিলা পাতা, দৈনিক দাবানল | ১৫/০২/২০০৯ইং |
| রনজিনা সাবের | শিক্ষক, রোকেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়<br>পায়রাবন্দ, রোকেয়া পরিবারের সদস্য<br>রোকেয়ার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মশিউজ্জামান<br>সাবের-এর কন্যা | ২৮/০৪/২০০৯ইং |
| শাহীন রহমান | সম্পাদক, একতা<br>লেখক, গবেষক | ০৫/০৩/২০০৯ইং |
| মাহফুজা বেগম | প্রভাষক, পায়রাবন্দ বেগম<br>রোকেয়া স্মৃতি ডিগ্রি উচ্চ বিদ্যালয় | ২৫/০৩/২০০৯ইং |